সাক্ষরতা বুলেটিন

২৩৯

বৈশাখ ১৪২১

এপ্রিল ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৩৯ বৈশাখ ১৪২১ এপ্রিল ২০১৪

সূচিপত্র

৩ **প্রফেসর মু. রিয়াজুল ইসলাম**
সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত প্রবীণ জীবনের জন্য প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণ

৮ **শফি আহমেদ**
বৈশাখী উৎসবের সুবিস্তৃত দিগন্ত

১২ **মো. জসীম উদ্দীন**
শিক্ষকদের জন্য আহ্বান- চাই মর্যাদা, ন্যায্য অধিকার ও জবাবদিহিতা

১৭ **ড. খন্দকার নেছার আহমেদ**
বাংলার আবহমান স্মৃতিতে চিরভাস্বর: বাংলা নববর্ষ

২০ **সাঈদুল আরেফীন**
উৎসবে আয়োজনে বাঙালির বৈশাখ

২২ **আবু রেজা**
পহেলা বৈশাখে

২৪ **সাকিলা মতিন মৃদুলা**
সত্যের নারী পুরুষ

২৬ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

প্রফেসর মু. রিয়াজুল ইসলাম

সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত প্রবীণ জীবনের জন্য প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণ

প্রবীণতা কয়েক প্রকারের হতে পারে। যেমন বয়ঃক্রমিক প্রবীণতা, পেশাগত প্রবীণতা ও অবস্থানগত প্রবীণতা। এই প্রবন্ধে, বয়ঃক্রমিক প্রবীণতাকে কেন্দ্রবিন্দু করে সিনিয়র সিটিজেন তথা দেশের জ্যেষ্ঠ নাগরিকগণের সমৃদ্ধ প্রবীণ জীবনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা নিরূপণসহ কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায়, তারই রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

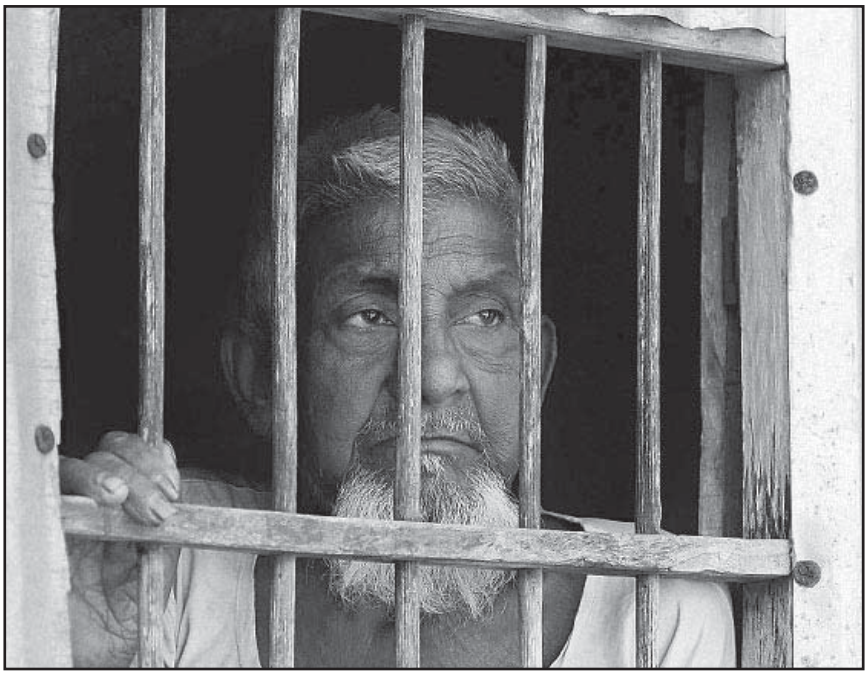

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে সিনিয়র সিটিজেন তথা প্রবীণ নাগরিক- এর কোন আইনগত সংজ্ঞা নেই তবে বর্তমানে National Policy on Elderly People বা জাতীয় বয়স্ক নীতি চূড়ান্ত হওয়ার পথে।

দেশে দেশে বয়ঃক্রমিক প্রবীণতায় বয়োবৃদ্ধ হওয়া বা প্রবীণতা অর্জনের বয়সে তফাৎ দেখা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ষাট বছর। বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবসর গ্রহণের বয়স ষাট। তা চাকুরি বা পারিবারিক কাজ থেকে অবসর, যে কোনটি হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে ষাট বৎসর বয়সকে প্রবীণতা শুরুর বয়স বলে গণ্য করা হলো।

সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী বয়োবৃদ্ধ বা প্রবীণ নাগরিকগণ কর্ম সাফল্যমুখর অতীতের অধিকারী। চলমান মানব জীবনের এই ধাপে নব্য প্রবীণকে সামাজিক অবস্থান, মানসিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবারের প্রভাব বলয়ে অবস্থানগত কারণে নতুন সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। সমাজে ও পরিবারে নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়ে যেমন সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়, তেমনি নতুন সম্ভাবনার বিকাশে তৎপরতা প্রর্দশনেরও প্রয়োজন দেখা যায়। প্রবীণতার শুরুটা অনেকটা হঠাৎ পাওয়া জীবনের মতো। আবার তার জন্য যেমন প্রস্তুত হওয়া দরকার, তেমনি দরকার অব্যাহত সমৃদ্ধ/তৃপ্তিকর জীবন, সুখী প্রবীণ জীবন। তাই, সমৃদ্ধ তথা স্বাস্থ্যকর প্রবীণ/বৃদ্ধ জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে সকল প্রবীণের প্রশিক্ষণ চাহিদা সম্পূর্ণভাবে এক রকমের না হলেও সাধারণ চাহিদা সকলেরই রয়েছে। এ প্রশিক্ষণ ষাট বছর বয়স হওয়ার একটু আগে বা ষাট বছর হওয়ার পর পরই হওয়া ভাল। অবশ্য পরবর্তীকালে বিশেষ চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কথা হলো, নব্য প্রবীণগণ যদি প্রবহমান প্রবীণ জীবনের জন্য যথার্থই ক্ষমতায়িত হন, তবে জীবনের শেষ অবধি মনোবল বজায় রেখে স্বাস্থ্যকর, সমৃদ্ধ ও তৃপ্তিকর জীবনাচার বজায় রাখতে পারবেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকতর প্রবীণবান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তোলায় অবদান রাখতে পারবেন, যা প্রতিটি ভাল মানুষেরই একান্ত কামনা।

১.১ প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

জীবনের জন্য যেমন প্রকৃতির নিয়ম আছে, তেমনি আছে

সামাজিক ও পারিবারিক রীতি-নীতি ও ন্যায়বিধান। প্রকৃতির নিয়মে গর্ভকাল পার করে শিশু জন্ম নেয় বেড়ে ওঠার জন্য। অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সামাজিক রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধের মধ্য দিয়ে শিশু বেড়ে ওঠে। শৈশব, কৈশোর পার করে কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে যৌবনে সে দক্ষতা ও যোগ্যতার অধিকারী হয়। পরিবার ও সমাজের যৌথ বিনিয়োগে সেই জন্ম নেওয়া শিশুটি আজ যুবা, কর্মোক্ষম। পরিবার ও সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা রয়েছে। প্রতিদান যেমন দিতে হবে, তেমনি রয়েছে স্বকীয় আত্মবিকাশ ও উৎকর্ষ অর্জনের নিরন্তর তাগিদ। শুরু হয় যেন রানারের পথচলা। কুড়ি থেকে ষাট, ব্যাপ্তি প্রায় চল্লিশ বছরের। তাই সাধারণত পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষের কর্ম জীবনের ব্যাপ্তি। ষাট বছর বয়স পূর্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্ম জীবনের অবসান। তারপর!

তারপর অন্তিম অনন্তের পথের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু। অনেক কারণে সে যাত্রাপথ এক এক জনের জন্য এক এক রকমের হলেও তা কারো জন্যই সর্বতো মসৃণ নয়। এপথ যেন রূপনারানের কূলে বিকাল থেকে শুরু হয়ে গোধূলি-সন্ধ্যা পেরিয়ে নিশারম্ভে শেষ হয়, যেখানে তাঁর অনন্তের পথের শুরু। তবে এপথ কারো জন্য বিকালেই শেষ হয়, কেউবা তা শেষ করেন গোধূলিতে, বেশির ভাগই সন্ধ্যায় আর হাতে গোনা ভাগ্যবানগণ তা শেষ করেন রাত্রির আরম্ভে। যে যেখানেই শেষ করুন, সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর অনন্তের পথ। শেষের এই সময়টা যতদূর সম্ভব আনন্দদায়ক, স্বাস্থ্যকর, প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য হওয়াই কল্যাণকর। তাই, জীবনের অবশেষটুকু সমৃদ্ধ করার জন্য কার্যকর জীবন পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণের উপযোগিতাকে মানতেই হবে। এতে ব্যক্তি তার জীবন পরিচালন ব্যবস্থার ঘাটতিগুলোকে শনাক্ত করে উন্নয়নের পথে সক্ষমতা অর্জন করবেন।

১.২ প্রশিক্ষণের বিবেচ্য বিষয়াবলী

প্রবীণতা জীবনের শেষ ধাপের সংকটপূর্ণ প্রান্তিক অবস্থানও বটে। প্রবীণতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যই প্রয়োজন প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ হল প্রবীণকে আরো সৃষ্টিশীল, প্রাণবন্ত, বার্ধক্যসহিষ্ণু ও বার্ধক্যজয়ী, অভিযোজনসক্ষম এবং ইতিবাচক করে তোলার জন্য। এ প্রশিক্ষণ জীবনের অবশেষটুকুর সাশ্রয়ী, কার্যকর, পরিণামদর্শী ও আনন্দদায়ক ব্যবহারের জন্য। স্বীয় অন্তরাগের আবীরে বিমোহিত করার জন্য, বিমোহিত হওয়ার জন্য এবং মহাকালের অনন্ত যাত্রায় নিজেকে সফলভাবে মিলিয়ে নেয়ার জন্যই এ প্রশিক্ষণ । এ যেন মৃত্যুঞ্জয়ী কবির-

'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে॥

প্রস্তাবিত প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণ স্বল্পকালীন হলেও তা পরবর্তী প্রবীণকালীন বিশেষ চাহিদা ও সমস্যাকেন্দ্রিক স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং এটির বিষয়ের সংখ্যাও কিঞ্চিত অধিক। এখন প্রশ্ন হলো এজন্য প্রধান প্রধান প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র বা বিষয়গুলো কী?

প্রশিক্ষণ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রবীণদের জন্য প্রথমেই মনে আসে তা হলো- স্বাস্থ্য। বয়স বাড়া মানে, যত্নের মধ্যেও শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বয়স বাড়া এবং ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়া। ফলে কারো কারো শরীরে স্থায়ী অসুখের বাসা বাঁধা, মাঝে মধ্যে অসুখে পড়া ও অসুস্থ থাকা। এক্ষেত্রে অসুখের লক্ষণ অনুধাবন, চিকিৎসক নির্বাচন, অর্থের যোগান এবং পরিবারের অন্তর্গত সেবাদানকারীর আস্থা অর্জন ও সেবা লাভ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও প্রবীণের রোগের দমন/প্রশমন ও রোগের সঙ্গে অভিযোজনে স্বাস্থ্য পদ্ধতিসমূহসহ শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও চলাফেরার জন্য ব্যবহৃত উপকরণসমূহের ওপর নিবিড় প্রশিক্ষণ দরকার। আরো দরকার, পুষ্টি, ফিজিওথেরাপি ও শরীরচর্চা জ্ঞান ও দক্ষতা। স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষ দরকার সহনশীলতা ও সু-আচরণের বিকাশ যা সহযোগী ও সেবাদানকারীকেও উৎসাহিত করবে। প্রবীণকে স্বীয় পরিপার্শ্বে উচ্চতর মানের স্বকীয় ভাবমূর্তি নিয়েই বাঁচতে হবে। উপরন্তু স্বীয় পরিপার্শ্বে অবস্থিত স্বাস্থ্যসেবা সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থার পরিচিতিসহ প্রবীণকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়েও পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। বাড়িতে যত্ন প্রদানকারীকে প্রবীণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখাও একটি উত্তম কৌশল। তবে প্রবীণকে বাড়িতে/সংসারে সেবা -সহযোগিতা দানকারীগণ যেন দেখেন কবিগুরুর এই দৃষ্টিকোণ থেকে-

কাল যে কুসুম পড়বে ঝরে তাদের কাছে নিস গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু এই বছরের মৌচাকেতে।

এ কাজটির গুরুত্বকে অধিক উচ্চকিত করার ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সমাজ কর্মীগণের, এনজিও, সমাজভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের।

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার তা হলো মনোস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ মূলত আচরণিক পরিবর্তন যা উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ওপর নির্ভরশীল। সন্দেহ নেই, মানবকূল অফুরান মানব সম্পদের আকর। এ সম্পদের মূল উপাদান গুণ ও কাজ। মানব সম্পদের দুর্ভাগ্যজনক দিক হলো, প্রতিটি গুণ ও কাজের দর্পণবিম্ব হলো ১৮০° বিপরীত, দোষ ও অপকর্ম/কুকর্ম। একজন সৈনিক দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে

সমন্বয়সাধন ক্ষমতাও কমে আসে। ফলে পথচলায় যুগপৎ সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বলা যায়, নতুন করে পথচলা প্রশিক্ষণ, প্রবীণকে জীবনের প্রতি অধিকতর দায়িত্বশীল করে তুলবে। জীবনীশক্তির সচেতন ও কার্যকর ব্যবহার প্রবীণ জীবনকে সফল ও মহিমান্বিত করে তৎসম্পর্কিত যথার্থ উদাহরণসমূহ প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণে থাকা জরুরি বলে মনে হয়।

আরো কথা আছে, তা হলো, প্রবীণের বিগত জীবনের সকল সঞ্চয়ের "সোনার ধান" যা তাঁর বাকি জীবনের "ক্ষুৎপিপাসা"র "কড়ি" তা যেন কোন নৌকা দস্যুরা লুট করে মালিককে পানিতে ফেলে না যেতে পারে সে বিষয়টিও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এটিতে রয়েছে আব্রাহাম মাসলো'র চাহিদা পদসোপানের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ, যা তাঁর তত্ত্বের ভিত রচনা করে। আসলে সংরক্ষণশীলতার অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রবীণগণের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় আইন এবং ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা দরকার। প্রবীণের শারীরিক চাহিদা ও নিরাপত্তার চাহিদার বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তা ভুললে চলবে না।

প্রশিক্ষণে প্রবীণকে প্রবীণের অধিকার অনুধাবনের সুযোগ দিতে হবে। প্রবীণ নাগরিকগণের প্রশিক্ষণে অবশ্য আন্তর্জাতিক বয়স্ক অধিকার, বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে বয়স্ক অধিকার/ নাগরিক অধিকারসহ একটি উচ্চ আয়, একটি মধ্য আয়, একটি নিম্ন আয় দেশ এবং ভারতের প্রবীণ নাগরিকগণের অধিকার ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর ফল হবে খুবই শুভ। কারণ প্রস্তাবিত প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণের উদ্দীষ্ট ব্যক্তিবর্গের বয়স ষাটের কিছু নিচে-ওপরে; এখনো তাঁরা প্রচুর মানসিক শক্তি, শারীরিক শক্তি ও মনোবলের অধিকারী। অনেকের মধ্যেই রয়েছে কার্যকর নেতৃত্বের গুণাবলি। এঁদের পক্ষেই অধিকার ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক চিত্রের আলোকে প্রবীণ/বয়স্কদের কল্যাণে স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে কৌশলী ও কার্যকর নেতৃত্ব দান করা সম্ভব। তাঁদের উদ্যম ও উদ্যোগ রাষ্ট্রকে এ লক্ষ্যে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও সাহায্য করবে।

প্রবীণ সেবায় হোম ভিজিটের ব্যবহারিক মূল্য অনেক। বিষয়টি আলোচ্য প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এলাকাভিত্তিক প্রবীণ সেবা সংগঠন গড়ে তোলায় তরুণ ও যুবাদের উদ্বুদ্ধকরণ, হোম ভিজিটের উদ্দীষ্ট দল শনাক্তকরণ, হোম ভিজিট সেবার কর্মসূচি, হোম ভিজিটের ব্যয় নির্বাহ পদ্ধতি; হোম ভিজিটের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বাড়ি, বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর প্রবীণবান্ধব করে তোলা ইত্যাদিই বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির কারণ। প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ এলাকায় এ কর্মসূচির সূচনাদ্বীপ জ্বেলে পরবর্তীকালে অতি প্রবীণ/বৃদ্ধকালে এই সেবা উপভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, প্রবীণগণের যতই দিন যায়, ততই তাঁদের সহপাঠী ও বন্ধুদের সংখ্যা কমে আসতে থাকে। হোম ভিজিট প্রবীণের একাকীত্ব লাঘবেই কেবল সাহায্য করে না, সেবাদানকারীগণকেও উদ্বুদ্ধ করে ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে। হোম ভিজিট সেবাদানকারীগণকে প্রবীণের সমস্যা অনুধাবনেও কার্যকরভাবে সাহায্য করে। হোম ভিজিটের ভেতর রয়েছে বর্তমানের তৃপ্তি এবং ভবিষ্যতের সঞ্চয়।

প্রশিক্ষণে প্রবীণ/বয়স্কদের সমস্যা ও চাহিদার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। এর প্রধান কারণ হলো, প্রবীণতার সকল বয়ঃক্রমের ব্যক্তির আশা, অতি মানসম্পন্ন না হোক, তিনি যেন কাছের সকলের মত একই জীবন ছন্দে ছন্দায়িত থেকে অনন্তের সুরালোকে পাড়ি দেন। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক প্রবীণই তাঁর "রূপ-নারানের কূলে" পৌঁছে টের পান, তিনি আজ আর তেমন বাঞ্ছিত নন, অবহেলার ছোট ছোট তীর যেন তাঁর দিকে তাক করা। তিনি এখন বেশ বৃদ্ধ, তাই যেন সংসারের বোঝা। তাঁর স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন, স্বামী/স্ত্রী মারা গেছেন, আর্থিক সচ্ছলতা কম, সম্পদ-সম্পত্তি ছেলেমেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে, ছেলেমেয়েদের সংসার আলাদা আলাদা, মা-বাবা তার সংসারে থাকুক তাতে তাদের চরম অনীহা। এরই মধ্যে যে সংসারে/আশ্রমে ঠাঁই হয়, সেখানেও সেবা/সাহায্যদানকারীর মধ্যে দেখা যায় না তেমন কোন স্বতঃস্ফূর্ততা। এক্ষেত্রে ঔষধ-পথ্য ও থাকার ব্যবস্থার কারণে কোন রকমে ব্যক্তির শারীরিক ও নিরাপত্তা চাহিদার নোনা ধরা গোছের পূরণ হলেও ফাঁক থাকে তাঁর অহম চাহিদা ও আত্মপূরণ চাহিদার পরিপূরণে। অতৃপ্ত চাহিদার সাগরে তৃপ্তির ক্ষুদ্র দ্বীপ হলো নাতনী-নাতি ও তাদের বন্ধুরা। তাদের সঙ্গে গল্প, পাঠদান, অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্কুলে আনা- নেওয়ার কাজে কিছু হলেও সামাজিক চাহিদার পূরণ ঘটে। এরূপ প্রবীণদের বিষয়ে প্রশিক্ষণরত নব্য প্রবীণগণ যদি সচকিত ও তথ্যপ্রাপ্ত হন, তবে তাঁরা এ অবস্থার উন্নয়নে ফলপ্রসূ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন। আগে থেকেই শিশু মননকে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে পারবেন বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম ও তার বাস্তবায়নকে অধিকতর মানবিকীকরণ ও সামাজিকীকরণে। এ ছাড়াও তাঁরা সরকার, এনজিও, স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সমাজকে কার্যকর সহযোগিতা দিয়ে প্রবীণবান্ধব, সমাজবান্ধব ও ন্যায়বিচারবান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করতে পারবেন।

১.৩ প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম রচনা

বাংলাদেশে আমরা প্রশিক্ষণ বলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য পেশা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকেই বুঝি। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য প্রশিক্ষণ তা এমনই এক প্রস্তাবনা যা বাংলাদেশে আজো

সমন্বয়সাধন ক্ষমতাও কমে আসে। ফলে পথচলায় যুগপৎ সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বলা যায়, নতুন করে পথচলা প্রশিক্ষণ, প্রবীণকে জীবনের প্রতি অধিকতর দায়িত্বশীল করে তুলবে। জীবনীশক্তির সচেতন ও কার্যকর ব্যবহার প্রবীণ জীবনকে সফল ও মহিমান্বিত করে তৎসম্পর্কিত যথার্থ উদাহরণসমূহ প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণে থাকা জরুরি বলে মনে হয়।

আরো কথা আছে, তা হলো, প্রবীণের বিগত জীবনের সকল সঞ্চয়ের "সোনার ধান" যা তাঁর বাকি জীবনের "ক্ষুৎপিপাসা"র "কড়ি" তা যেন কোন নৌকা দস্যুরা লুট করে মালিককে পানিতে ফেলে না যেতে পারে সে বিষয়টিও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এটিতে রয়েছে আব্রাহাম মাসলো'র চাহিদা পদসোপানের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ, যা তাঁর তত্ত্বের ভিত রচনা করে। আসলে সংরক্ষণশীলতার অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রবীণগণের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় আইন এবং ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা দরকার। প্রবীণের শারীরিক চাহিদা ও নিরাপত্তার চাহিদার বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তা ভুললে চলবে না।

প্রশিক্ষণে প্রবীণকে প্রবীণের অধিকার অনুধাবনের সুযোগ দিতে হবে। প্রবীণ নাগরিকগণের প্রশিক্ষণে অবশ্য আন্তর্জাতিক বয়স্ক অধিকার, বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে বয়স্ক অধিকার/ নাগরিক অধিকারসহ একটি উচ্চ আয়, একটি মধ্য আয়, একটি নিম্ন আয় দেশ এবং ভারতের প্রবীণ নাগরিকগণের অধিকার ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর ফল হবে খুবই শুভ। কারণ প্রস্তাবিত প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণের উদ্দীষ্ট ব্যক্তিবর্গের বয়স ষাটের কিছু নিচে-ওপরে; এখনো তাঁরা প্রচুর মানসিক শক্তি, শারীরিক শক্তি ও মনোবলের অধিকারী। অনেকের মধ্যেই রয়েছে কার্যকর নেতৃত্বের গুণাবলি। এঁদের পক্ষেই অধিকার ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক চিত্রের আলোকে প্রবীণ/বয়স্কদের কল্যাণে স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে কৌশলী ও কার্যকর নেতৃত্ব দান করা সম্ভব। তাঁদের উদ্যম ও উদ্যোগ রাষ্ট্রকে এ লক্ষ্যে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও সাহায্য করবে।

প্রবীণ সেবায় হোম ভিজিটের ব্যবহারিক মূল্য অনেক। বিষয়টি আলোচ্য প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এলাকাভিত্তিক প্রবীণ সেবা সংগঠন গড়ে তোলায় তরুণ ও যুবাদের উদ্বুদ্ধকরণ, হোম ভিজিটের উদ্দীষ্ট দল শনাক্তকরণ, হোম ভিজিট সেবার কর্মসূচি, হোম ভিজিটের ব্যয় নির্বাহ পদ্ধতি; হোম ভিজিটের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বাড়ি, বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর প্রবীণবান্ধব করে তোলা ইত্যাদিই বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির কারণ। প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ এলাকায় এ কর্মসূচির সূচনাদ্বীপ জ্বেলে পরবর্তীকালে অতি প্রবীণ/বৃদ্ধকালে এই সেবা উপভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, প্রবীণগণের যতই দিন যায়, ততই তাঁদের সহপাঠী ও বন্ধুদের সংখ্যা কমে আসতে থাকে। হোম ভিজিট প্রবীণের একাকীত্ব লাঘবেই কেবল সাহায্য করে না, সেবাদানকারীগণকেও উদ্বুদ্ধ করে ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে। হোম ভিজিট সেবাদানকারীগণকে প্রবীণের সমস্যা অনুধাবনেও কার্যকরভাবে সাহায্য করে। হোম ভিজিটের ভেতর রয়েছে বর্তমানের তৃপ্তি এবং ভবিষ্যতের সঞ্চয়।

প্রশিক্ষণে প্রবীণ/বয়স্কদের সমস্যা ও চাহিদার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। এর প্রধান কারণ হলো, প্রবীণতার সকল বয়ঃক্রমের ব্যক্তির আশা, অতি মানসম্পন্ন না হোক, তিনি যেন কাছের সকলের মত একই জীবন ছন্দে ছন্দায়িত থেকে অনন্তের সুরালোকে পাড়ি দেন। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক প্রবীণই তাঁর "রূপ-নারানের কূলে" পৌঁছে টের পান, তিনি আজ আর তেমন বাঞ্ছিত নন, অবহেলার ছোট ছোট তীর যেন তাঁর দিকে তাক করা। তিনি এখন বেশ বৃদ্ধ, তাই যেন সংসারের বোঝা। তাঁর স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন, স্বামী/স্ত্রী মারা গেছেন, আর্থিক সচ্ছলতা কম, সম্পদ-সম্পত্তি ছেলেমেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে, ছেলেমেয়েদের সংসার আলাদা আলাদা, মা-বাবা তার সংসারে থাকুক তাতে তাদের চরম অনীহা। এরই মধ্যে যে সংসারে/আশ্রমে ঠাঁই হয়, সেখানেও সেবা/সাহায্যদানকারীর মধ্যে দেখা যায় না তেমন কোন স্বতঃস্ফূর্ততা। এক্ষেত্রে ঔষধ-পথ্য ও থাকার ব্যবস্থার কারণে কোন রকমে ব্যক্তির শারীরিক ও নিরাপত্তা চাহিদার নোনা ধরা গোছের পূরণ হলেও ফাঁক থাকে তাঁর অহম চাহিদা ও আত্মপূরণ চাহিদার পরিপূরণে। অতৃপ্ত চাহিদার সাগরে তৃপ্তির ক্ষুদ্র দ্বীপ হলো নাতনী-নাতি ও তাদের বন্ধুরা। তাদের সঙ্গে গল্প, পাঠদান, অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্কুলে আনা- নেওয়ার কাজে কিছু হলেও সামাজিক চাহিদার পূরণ ঘটে। এরূপ প্রবীণদের বিষয়ে প্রশিক্ষণরত নব্য প্রবীণগণ যদি সচকিত ও তথ্যপ্রাপ্ত হন, তবে তাঁরা এ অবস্থার উন্নয়নে ফলপ্রসূ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন। আগে থেকেই শিশু মননকে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে পারবেন বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম ও তার বাস্তবায়নকে অধিকতর মানবিকীকরণ ও সামাজিকীকরণে। এ ছাড়াও তাঁরা সরকার, এনজিও, স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সমাজকে কার্যকর সহযোগিতা দিয়ে প্রবীণবান্ধব, সমাজবান্ধব ও ন্যায়বিচারবান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করতে পারবেন।

১.৩ প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম রচনা

বাংলাদেশে আমরা প্রশিক্ষণ বলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য পেশা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকেই বুঝি। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য প্রশিক্ষণ তা এমনই এক প্রস্তাবনা যা বাংলাদেশে আজো

আলোর মুখ দেখেনি। এ প্রশিক্ষণ আমাদের দীর্ঘ পরিচিত বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education) ও গণসাক্ষরতা (Mass Literacy) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ হলো প্রবীণের ক্রমক্ষীয়মাণ জীবনে পরিপার্শ্বের সঙ্গে উৎকর্ষমণ্ডিত অভিযোজনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ সফলভাবে জীবন দিগন্তে পৌঁছানোর মশাল, যার আলোর রেশ থেকেই যাবে ব্যক্তির দিগন্তরেখা অতিক্রমের পরও। তাই সন্দেহ নেই এই প্রবন্ধে দেওয়া বিষয়সমূহ শিক্ষাক্রমের কাঠামো রচনা করতে পারে, তবে তা দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণের তাৎপর্য, গভীরতা ও গুরুত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই। মূলত, এই প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন বেশ জটিল, অংশীদারিত্বমূলক এবং সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। মূলত, এরূপ একটি খসড়া শিক্ষাক্রমিক কাঠামোর আলোকে পরিসংখ্যানের নিয়মে সমগ্র বাংলাদেশের জন্য বহু স্তর ও বহু গুচ্ছ বিবেচনায় নিয়ে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা চয়ন করে জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ইন-ডেপ্থ আলোচনা ও অন্যান্য অনুসরণীয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা যেতে পারে। নমুনা চয়নে সমগ্র দেশের কথা মাথায় নিয়ে সকল আর্থ-সমাজিক গোষ্ঠীর কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, পেশাজীবী ও বিভিন্ন বয়ঃক্রমের প্রবীণগণ অন্তর্ভুক্ত হবেন। নমুনায়নে মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও জরা বিশেষজ্ঞ, নার্স, শিক্ষাবিদ এবং প্রশিক্ষক যেন অন্তর্ভুক্ত হন, তা নিশ্চিত করতে হবে। একবার একটি প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে পারলে পরবর্তীকালে স্থানীয় বিশেষ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা সহজ হবে। সন্দেহ নেই, শিক্ষাক্রম প্রণয়নের এমন আঁটঘাট বাঁধা পদ্ধতি দীঘসূত্রী বটে, তবে তাও নিরঙ্কুশ উত্তম শিক্ষাক্রম রচিত হওয়ার গ্যারান্টি দেয় না। তাই কার্যকর বিকল্পসমূহও ভেবে দেখে ক্রমিক ধাপে এক সময় চরম উৎকর্ষমণ্ডিত শিক্ষাক্রমে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

ধারাবাহিকতাক্রমে উল্লেখ্য যে, প্রবীণগণকে সমাজের/দেশের আর্থিক বোঝা হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা রয়েছে। এটা অন্যায্য, কারণ, প্রবীণ সুদীর্ঘকাল ব্যাপী শ্রমদান করে দেশের অর্থনীতিতে শুধু ত্বরনই সৃস্টি করেন না, অর্থনৈতিক ত্বরন অনাগত কালব্যাপী অব্যাহত রাখার জন্য কর্মীবাহিনীও সৃস্টি করে যান। অবদানের প্রাপ্য লভ্যাংশ প্রবীণ জীবনের বাকি অংশেও ভোগ করে শেষ করা সম্ভব নয়। পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য এটা অবশ্যই অপরিসীম গৌরবের যে, তাঁরা প্রবীণ কল্যাণে বিবিধ ব্যবস্থা গড়ে তুলছেন যা সকলকে রাখে পরিতৃপ্ত এবং প্রবীণ জীবনকে করে সমৃদ্ধ। তা নিশিদিনের স্বাস্থ্যবতী পরিবার, সমাজ ও জাতির পরিচয় লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার আলোচ্য প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণ বা তৎপরবর্তী প্রবীণকালীন প্রশিক্ষণ মহানবীর "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা"র উপদেশকেই বাস্তবে রূপদান করে। তাই আজন্ম অঙ্গীকারের সুখী-সমৃদ্ধ-শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বার্থে যথা শীঘ্র সম্ভব বাস্তবানুকূল প্রাক-প্রবীণ প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ শুরু করার সময় আজ এসে গেছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এনজিও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও প্রবীণ বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ স্থানীয়ভাবে এ্যাডহক ভিত্তিতে নিজ নিজ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে পারে, যা ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শিক্ষাক্রমের স্বর্ণদুয়ার খুলে দেবে। পক্ষান্তরে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগ/অনুষদের নিয়মিত শিক্ষাকোর্সে একটি ঐচ্ছিক/নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে "প্রাক-প্রবীণ শিক্ষা" অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এর ফলে মানব জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একটি একাডেমিক মাত্রা লাভ করে মানব জীবনের অনন্ত বিকাশে একটি মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনের এই বিশেষ ক্ষেত্রটি প্রশিক্ষণ/শিক্ষার বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশে মানব কল্যাণের একটি অনুদঘাটিত দ্বার কল্যাণ বায়ুপ্রবাহের জন্য চিরদিনের মতো খুলে যাবে।

প্রথম কান্নার অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে মানুষ তার পৃথিবীর জীবন শুরু করে। এরপর নবজাতক-শৈশব-কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত বা পূর্ণবয়স্ক (Adulthood) হয়। এতে কেটে যায় প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর। শুরু হয় ব্যক্তির কর্ম জীবন যা চলে প্রায় ষাট বছর বয়স পর্যন্ত। ব্যক্তি শুরু করে বার্ধক্য বা প্রবীণতার স্বাদ আস্বাদনের। ক্রমান্বয়ে বয়স আরও বাড়ে, আরো হয়তোবা পনেরো বা কুড়ি বছর পর নিকটজনদের কাঁদিয়ে ব্যক্তিকে জীবনরেখা অতিক্রম করে চলে যেতে হয় পরলোকে। ঘটে মানব জীবনচক্রের সমাপ্তি। বয়ঃপ্রাপ্ত বা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর যে জন চৌকসভাবে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর কাজের মধ্য দিয়ে পরিবার ও সমাজকে সেবা দান করলেন, তাঁর নিশ্চয়ই জীবনের অবশেষটুকু সম্মানের সঙ্গে ও চৌকসভাবে কাটাবার অধিকার আছে। এই প্রবন্ধের ভিত্তিও তাই। বলা যায়, প্রবীণের ক্ষমতায়ন এবং প্রবীণ উন্নয়নে সমাজকে অধিকতর সচেতন ও সংবেদনশীল করে কার্যকর ব্যবস্থা উদ্ভাবনে উৎসাহিত করাও এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। গভীর আশা, ক্রমিক ধাপে, প্রবন্ধে ব্যক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলে প্রবীণগণের জীবনে দেখা দেবে আশার আলো। আমরা সোনার বাংলাদেশের লক্ষ্যে অনেকটা পথ এগিয়ে যাব।

প্রফেসর মু. রিয়াজুল ইসলাম
সাবেক সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষাক্রম
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

শ ফি আ হ মে দ

বৈশাখী উৎসবের সুবিস্তৃত দিগন্ত

একটা বিষয়ে এখন আর কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, ঢাকায় বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে প্রতি বছরই অধিকতর প্রবৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রবৃদ্ধি একটা কারিগরি শব্দ এবং তার যোগ প্রধানত অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যানশাস্ত্রের সঙ্গে। মজার ব্যাপার হল, দিনে দিনে বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ উৎসব উদযাপন এমন মাত্রা এবং ব্যাপকতা অর্জন করেছে যে, ইদানিং এই উৎসবের একটা পূর্ণতর ধারাভাষ্য রচনা করতে গেলে উল্লিখিত দুই শাস্ত্রের তত্ত্বগত বিবেচনাকেও প্রায় অনিবার্যভাবেই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

এবারের পহেলা বৈশাখের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঢাকার মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বেনজীর আহমেদ নববর্ষের প্রথম দিনে, বিশেষত ঢাকার শাহবাগ এবং সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার এক পর্যায়ে বলছিলেন যে, এই উপলক্ষে এই এলাকায় কত সংখ্যক মানুষ সম্মিলিত হন, তার একটা হিসেব বের করার চেষ্টা নেয়া হবে। এ এক বিশাল, দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব কাজ। আজকের তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে হয়ত এমন কর্মসম্পাদন নেহাতই অসাধ্য নয়। পুলিশ কমিশনারের এমন পরিকল্পনা অন্তত এবারই সফল করার ব্যাপারে একটা আমতা আমতা ভাব ছিল তার কণ্ঠস্বরে। তাই জনসমুদ্রে কী পরিমাণ মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন এবার, তার পরিসংখ্যানগত বিবরণী পাওয়া যায়নি।

কিন্তু এমন প্রয়াসকে আমি গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি, যথেষ্ট প্রস্তুতি নেয়া হলে আগামী বছর বোধ হয় এই কাজটি যথার্থভাবে সমাধা করা যাবে। নিকট অতীতে আমরা মানবসম্মিলনীর মাধ্যমে জাতীয় পতাকা সৃজন এবং লাখো কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছি এবং গড়েছি। এবং এই দু'টো সম্মেলক আয়োজনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল, কাঠখড় অনেক তো পুড়েছিল বটেই, অর্থব্যয়টাও হয়েছিল চোখ ছানাবড়া করার মতই।

অথচ নববর্ষে শাহবাগ বলয়ে মানুষের যে বাস্তবিক ঢল নামে, তার জন্য কোন ঢাক-ঢোল পেটানোর দরকার হয় না, টেলভিশনের মাধ্যমে বার বার আহবান বা আমন্ত্রণ জানানোর দরকার পড়ে না। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর প্রায় অনিবার্য সহযোগিতা ছাড়া সরকারের কাছ থেকে কোন রকমের দয়া- দাক্ষিণ্য চাওয়ায় বা কোন ধরনের সাহায্যের দরকার পড়ে না। অবশ্য যেহেতু এটা দিনে দিনে একটা বিপুল বিশাল গণ-উৎসবে পরিণত হয়েছে, ত গণমাধ্যমে বেশ ক'দিন আগে থেকেই বিভিন্ন সংগঠনে আয়োজনের বিভিন্ন সূচি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা হয় কিন্তু দেশের বড় দুই রাজনৈতিক দলের সমাবেশ সম্পর্কে লোকজনকে জ্ঞাত করতে গিয়ে রিক্সায় বা অটোরিক্সায় মাই সংস্থাপন করে কোন 'ঐতিহাসিক সমাবেশে যোগ দান কর কোন আহবান' শুনিয়ে নগরবাসীর কান ঝালাপালা করা হয় না।

পরিপ্রেক্ষিতগত দিক থেকে খুবই বিপরীতমুখী একটা তুলনী বিষয় মনে এল। সৈয়দ শামসুল হকের অসাধারণ কাব্যনা *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়*-এর প্রথম দৃশ্যের কথা মনে প যায় বৈশাখের জনজোয়ার দেখে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তা হানাদার বাহিনীর আক্রমণে সন্ত্রস্ত পলাতক জনগোষ্ঠীর বাস্তভি ছেড়ে চলে যাবার এক মহাকাব্যিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে নাট্যকার এই দৃশ্যে। 'মানুষ আসতাছে' এই শব্দবন্ধ দ্বারা তি চারদিক থেকে আগত পলায়নপর অসহায় মানুষের পদবিক্ষেপে এক অবাক করা চিত্র এঁকেছেন। এর সঙ্গে যা তুলনীয় তা হ শাহবাগের দু'পাশে যে দু'টো পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হবার সে আছে, তার উপর যদি কেউ পহেলা বৈশাখের ভোর সাড়ে পাঁচ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন এবং দেখতে থাকেন কীভা দু'দিক থেকে, চার দিক থেকে মানুষ, অগণিত মানুষ শুধু ঢাক এই কেন্দ্রভূমিতে জড়ো হচ্ছে, তার পক্ষে সে-ও হবে এক বিচি অভিজ্ঞতা। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এবং টেলিভিশ চ্যানেলসমূহের আনুকূল্যে আমরা সে দৃশ্য হয়ত এখন ছোট পর্দ দেখতে পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যারা পয়লা বৈশাখের শাহব সম্মিলনী নিজের চোখে দেখেননি, মনে হয় টেলিভিশনের ছবি মাধ্যমেও তারা তাঁর সঠিক বিকল্প খুঁজে পাবেন না।

সাম্প্রতিক কালে অর্থাৎ বিগত ছয়/সাত বছরে ঢাকা শহরে পহে বৈশাখ পালনের মাত্রিকতা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে শাহবাগের জনসমুদ্রের কথা বলছি বটে, কিন্তু নববর্ষের উৎসবে ব্যাপ্তি সমগ্র ঢাকা শহরের তথা বাংলাদেশের অধিবাসীদের জ এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে উঠছে। অধিবাসীদের কথাটা প্রাসঙ্গি এই জন্যে যে, কূটনৈতিক বা অন্যান্য কারণে যেসব বিদে ঢাকায় বাস করেন, তাঁরা নববর্ষের এমন জনগণনন্দিত উদ্‌যাপ দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়ে যান। উৎসবের কেন্দ্র হিসে নিশ্চয়ই শাহবাগকে চিহ্নিত করতে হবে। তার একটা সত্যিকারে

ঐতিহাসিক যোগ আছে। **ছায়ানট** নামের অনন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে পাকিস্তানী বা সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিকার ও আগ্রাসন থেকে বাঙালিকে বাঁচানোর জন্য সঙ্গীতের মাধ্যমে যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল, তার সূত্র ধরেই নববর্ষ উদ্‌যাপন দিনে দিনে এমন উৎসবমুখর ও জনঅংশগ্রহণমূলক হয়ে উঠেছে।

ছায়ানট-এর পহেলা বৈশাখের সম্মিলনীর হাত ধরেই ক্রমে চারুকলা ইনসটিটিউটের মঙ্গল শোভাযাত্রার সাম্বাৎসরিক একটি রীতি গড়ে উঠেছে। শিশু পার্কের প্রবেশদ্বারে ঋষিজ শিল্পগোষ্ঠীর আয়োজনও এখন সাম্বাৎসরিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, **ছায়ানট**-এর অনুষ্ঠান শেষ হবার পর পরই রমনা পার্কের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় একই সময়ে ছোটখাট কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে নববর্ষ উদ্‌যাপনে নিজেদের অংশগ্রহণকে আলাদাভাবে স্পষ্ট করে তুলতে চায়। অনেক সময় দেখা গেছে, পাড়ার কোন গোষ্ঠী বা কোন অফিসের একটা সংঘ নিজেদের মত করে গান-বাজনা করতে থাকে, বাড়তি দর্শক আকর্ষণের কোন বাড়তি উৎসাহ তাদের মধ্যে নেই। আবার এরই মাঝে হয়ত কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্রে তারা কোন নামকরা শিল্পীকে হাজির করেন, তখন হয়ত অলসভাবে পার্কে হেঁটে বেড়ানো কিছু দর্শক জুটে যায়, উদ্যোক্তাদের কপাল ভাল থাকলে টিভি ক্যামেরা হাতে দু'এক জন প্রতিবেদকেরও কাকতালীয় উপস্থিতি দেখা যেতে পারে।

মঙ্গল শোভাযাত্রা যখন বাংলা একাডেমী, দোয়েল চত্বর ঘুরে রমনা পার্কের বৃত্তটা সমাপন করে আবার শাহবাগের চত্বরে ফিরে আসে, তখন যেন উৎসবের মূল অনুষ্ঠান শেষ হলেও, বৈশাখী মেলার আলাদা একটি চরিত্র ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। এই মেলা মানে অবশ্যই গ্রামীণ সামগ্রীর পসরা, বাঁশের বাঁশি, খেলনা, ঢোল, অপটু হাতের তৈরি মাটির পুতুল ও বিবিধ ঘর ও ঐতিহ্যিক রান্নার তৈজসপত্রের বিকিকিনি। কিন্তু এই মেলা অবশ্যই মনে করিয়ে দেয়, মেলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কথা। রবীন্দ্র-ভাবনায় অবশ্যই পল্লীর মাঠ, নদীতীর এবং বিশাল বৃক্ষতলের প্রতি মূল ইঙ্গিতটা ছিল। এই সমকালের ঢাকার সঙ্গে তার বহু যোজনের দূরত্ব। কিন্তু এর মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশার সঙ্গে একটা আত্মিক মিল খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। হয়ত একটা বিতর্ক তোলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে মেলার কথা বলতেন, তার মধ্যে গাঁয়ের সাধারণ মানুষের প্রাধান্য ছিল। ঢাকার নববর্ষের মধ্যে নাগরিক বৈশিষ্ট্যের অনেকটা প্রাধান্য দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির আত্মপরিচয় ঘোষণা করার যে আন্দোলন শুরু করেছিল **ছায়ানট**, তার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, লাখো মানুষকে নিজের মাটির পানে ফিরে চলার জন্য আহবান জ্ঞাপন। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবার পর ঠিক অমন কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনটা হয়ত ফুরিয়েছে, কিন্তু **ছায়ানট**-এর সাফল্য অনেক ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই যে ক্রমপ্রসারমান ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে নববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন আয়োজন চোখে পড়ছে, তা আবশ্যিকভাবেই **ছায়ানট**-এর উদ্যোগের প্রভাবে।

নববর্ষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ চৈত্র সংক্রান্তির। রমনার বটমূল নতুন বছরের প্রথম প্রভাতে একটা অশ্রুত ডাক দিয়ে যায়। **ছায়ানট**-এর প্রভাতী আয়োজন একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধি পেয়েছে। তাই ওইটার সঙ্গে কোন অনুষ্ঠানের তুলনা করা যাবে না। এমন একটা বোধ থেকেই সম্ভবত ঢাকার আর এক প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রিজওয়ানা চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'সুরের ধারা' চৈত্র সংক্রান্তি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে। এই আয়োজন নানা দিক থেকেই বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে বাঙালির পার্বণ উদ্‌যাপনে চৈত্র সংক্রান্তির মর্যাদা কোন অংশে কম নয়। গ্রাম বাংলার বহু জায়গায় এই দিন উদ্‌যাপনের ঐতিহ্য রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। এখনও আদিবাসী- অধ্যুষিত আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই দিনটি খুবই সমারোহে পালন করা হয়। তাই 'সুরের ধারা'-র ওই উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা মানতেই হবে। তা ছাড়া 'সুরের ধারা'

সংগঠন অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় বেশ সুরুচি ও শ্রমশীলতার সমন্বয় ঘটিয়েছিল।

আর একটা বিশেষ কারণে এই অনুষ্ঠানকে আমি স্বাগত জানিয়েছিলাম। লালমাটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আলাদাভাবে তাৎপর্যবহ। লালমাটিয়া-ধানমণ্ডি-মোহাম্মদপুর-- দীর্ঘদিন ধরেই শহরের মধ্যবিত্তের আবাসিক বৃত্ত হয়ে উঠেছে। ভিড়ের আধিক্যে, রাস্তায় যান চলাচল সীমিত করে দেয়া এবং বিশেষ করে প্রৌঢ়-বৃদ্ধজনের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনকভাবে অভিগম্য হওয়ার সুবাদে মধ্য রাত পর্যন্ত চলা চৈত্র সংক্রান্তির এই অনুষ্ঠান উপভোগ বেশ সহজ হয়ে উঠেছিল। ছোটরা, কিশোর-কিশোরীরাও জড়ো হত বিপুল সংখ্যায়। আমার এমন ধারণা হয়েছে যে, এদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ত বিভিন্ন অজুহাতে সকালে রমনার বটমূলে যাওয়ার ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী নয়। কিন্তু এমন একটা বিশেষ জায়গায় অনুষ্ঠান উপভোগ করা তাদের জন্য বেশ সুবিধাজনক। আর যেসব গান পরিবেশিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির নাড়ির যোগও রয়েছে। তবে দুভার্গ্যজনকভাবে, 'সুরের ধারা'-র এই অনুষ্ঠান এখন আর লালমাটিয়ার ওই স্কুলের মাঠে আয়োজন করা হয় না। তা চলে গেছে, আগারগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন কেন্দ্রের চত্বরে, তাতে স্বাভাবিক কারণেই মধ্যবিত্ত সমাজের আগের মত অংশগ্রহণ আর চোখে পড়ে না।

'সুরের ধারা'-র চৈত্র সংক্রান্তির এই আয়োজনকে পুঁজি করে পহেলা বৈশাখের ভোরে নববর্ষ উদযাপনের একটা দারুণ সুযোগ গ্রহণ করেছে দেশের অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল। সম্প্রচারের এই যুগে মানুষকে টিভির পর্দায় ধরে রাখার এই কৌশলে ব্যবসায়িক স্বার্থের বিষয়টা অনেকটা মুখ্য হয়ে উঠলেও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ও পরিপোষণার দিকটাকে খাটো করে দেখলে চলবে না। দেশের নানা প্রান্ত থেকে শিল্পীদের ঢাকায় নিয়ে এসে বিশাল মহড়ার মাধ্যমে তাদের প্রস্তুত করে নেয়ার মধ্যে নববর্ষ উদযাপন সত্যিই আলাদা একটা মাত্রা পেয়ে যায়। নিকট অতীতে চ্যানেল আই **ছায়ানট**-এর প্রভাতী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই তারা জনপ্রিয়তার সেই পুঁজিকে উত্তরকালে ব্যবহার করেছে। কিন্তু নববর্ষ উদযাপন যে ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে এই ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, সে বিষয়ে তো বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

টিভি সম্প্রচার সাম্প্রতিক কালে বাংলা নববর্ষ উদযাপনে সত্যিই একটা মুখ্য ভূমিকা রাখছে। এটা সত্যি কথা যে, শাহবাগ বা ঢাকার অন্যত্র এই উৎসব পালনে বর্হিমুখী জনস্রোত জ্যামিতিক হারে বেড়েছে। ঢাকায় রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ। কিন্তু বাইরে আসেন না, আসতে পারেন না, এমন মানুষের সংখ্যাও তো বিপুল। দেশীয় টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের হারকে হার মানিয়ে। তাই এবার দেখা গেছে, শিশু পার্ক চত্বর, বনানীর মাঠ, কলাবাগান মাঠ, রবীন্দ্র সরোবর, গুলশান পার্ক এমন আরো অনেক জায়গায় যে নববর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে, সেগুলো সম্প্রচারের জন্যও নির্দিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেল এগিয়ে এসেছে।

ঢাকায় এবং চট্টগ্রামে প্রায় একই সময় মঙ্গল শোভাযাত্রার পথ পরিক্রমা চলছিল। একটি টেলিভিশন চ্যানেল, কয়েক মিনিট ঢাকা, কয়েক মিনিট চট্টগ্রাম দেখাচ্ছিল, আবার একই সঙ্গে পর্দাটাকে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে দুই শহরের শোভাযাত্রা একই মুহূর্তে টেলিভিশনের পর্দায় উপস্থাপন করছিল। বাঙালির সোঁদা মাটির গন্ধ মাখা পহেলা বৈশাখ তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান আধুনিকায়নে যে কী বিপুল ও প্রবল হয়ে উঠেছে, তা দেখে আমরা সত্যিই মুখে হাঁ করা বিস্ময় মানি। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোটি বাঙালিও দারুণ উত্তেজনায় থরথরো পহেলা বৈশাখের বাংলাদেশ দেখে নিজেরা রোমাঞ্চিত বোধ করেন। সংস্কৃতির শিকড়ের প্রতি একটা অক্ষয় অদৃশ্য টান থেকে প্রবাসে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রীতিটাও বেশ পুরোনো। কিন্তু টিভি সম্প্রচার এবং ক্যামেরা প্রযুক্তির আধুনিকতার কল্যাণে তাঁদের অনুষ্ঠানও আমরা এদেশে বসেই দেখতে পারি।

অথচ উদযাপনের ইতিহাসটা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পহেলা বৈশাখ প্রধানত পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত বৃত্তের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল অনাদি কাল থেকেই। এই দিবস উদযাপনের চরিত্রটাও ছিল অমন। একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া হত, খাবারের তালিকায় ময়রার দোকানের মিষ্টির সঙ্গে বাড়িতে বানানো পায়েসও থাকতো। হালখাতার ব্যাপারটা বেশ চোখে পড়ত গ্রামের বা শহরের আচঁ লাগা বাজার মহল্লায়। এক্ষেত্রেও আমাদের আবশ্যিক ঋণ স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনিই শান্তিনিকেতনে ঋতু উৎসব পালনের যে রীতি প্রচলন করেন, তার মাধ্যমে নববর্ষ বরণের 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো' ধীরে ধীরে বোলপুরের গ্রামীণ সীমানা পেরিয়ে কোলকাতার নাগরিক সমাজে খুবই দুর্বল কিন্তু অনিবার্য ঢেউ তোলে। কিন্তু বাংলা নববর্ষ পালনের বর্তমান ব্যাপ্তি, আড়ম্বর ও জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য প্রথম ও প্রধান কৃতিত্বটা আবশ্যিকভাবেই দিতে হবে ঢাকার **ছায়ানট**-কে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। নববর্ষ উদযাপনের বিবিধ মাত্রা এখন এমনভাবে আমাদের জীবনকে স্পর্শ করছে যা, তা অবহেলা করার কোন উপায় নেই। এই বাংলাদেশে এখনো বহু মানুষ আছেন যারা নববর্ষ পালনের মধ্যে হিদুঁয়ানির গন্ধ পান। আবার একই সঙ্গে এমন এক গৌরব বোধ করতে তারা কুণ্ঠিত বোধ করেন না যে,

এই যে পহেলা বৈশাখের দিনপঞ্জিকা, তার তো প্রবর্তক ছিলেন মোগল বাদশাহ আকবর। নববর্ষ উদযাপনে এমন বিধর্মী ধারণায় অনেকে বিশ্বাস করেন বলেই তো রমনার বটমূলে **ছায়ানট**-এর অনুষ্ঠানে ভয়াবহ বোমা হামলা সংঘটিত হয়েছিল, যার বিধ্বংসী চরিত্র আফগানিস্তানের তালেবান জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর আক্রমণের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এই নৃশংসতার দৃষ্টান্ত ছাপিয়ে প্রকৃত বাস্তবতা হল, নববর্ষ উদযাপনে রমনার বটমূলের পথে জনজোয়ারের অদম্য স্ফীতি।

একটা বিষয়ের প্রতি অনেকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তারা নববর্ষ উদযাপনের এই প্রাবল্যের মধ্যে অন্য পিঠের কঠোর এক সমাজবাস্তবতাকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে চান। এবারেও একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ উপস্থাপনার মধ্যে এমন দৃশ্যায়ন দেখেছি যে, হতদরিদ্র মানুষদের কাছে এই পহেলা বৈশাখ পালনের কোন উত্তাপ নেই, উত্তেজনা নেই। দিন আনা, দিন খাওয়া জনগোষ্ঠীর কাছে নববর্ষের কোন দৃশ্যমান আবেদন নেই। এই সমাজবাস্তবতাকে উপেক্ষা অবশ্যই করা যাবে না। কিন্তু তার মাধ্যমে নতুন বছর পালনের উৎসবকে বক্র করে দেখার কিছু নেই।

এশিয়া আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের বিপুল সংখ্যক খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী দরিদ্র জনগোষ্ঠীভুক্ত। তাই বলে কি ইউরোপ-আমেরিকার ভোগবাদী সমাজে ক্রিসমাস পালনে বিব্রত বোধ করেন ওইসব দেশের জনগণ? পোপ হয়তো তাঁর প্রার্থনায় এইসব ভাগ্যবিড়ম্বিত ঈশ্বর-সন্তানের কথা সমবেদনার স্বরে উচ্চারণ করেন, তাই বলে কি ক্রিসমাসের বৈশ্বিক উৎসবের গায়ে কলঙ্কের টীকা দেয়া যায়? ঈদ উৎসব পালনের সময় আমাদের দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক অবস্থার কি আলাদা কোন উন্নতি হয়? আমরা কি ঈদ উৎসব পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকি? অথচ ইসলাম ধর্মেই তো বিশেষ স্পষ্টভাবে বলা আছে, নিজের সুখ প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাগ করে নাও। গুলশান হ্রদের একদিকের ধনাঢ্য সমাজ কি অন্য পারের বসত ভিটাহীন, ভবিষ্যৎবিহীন হতদরিদ্র মানুষের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেয়? উত্তর সবার জানা।

এই মৌলিক সমাজতাত্ত্বিক বিতর্কটা একটু পাশে সরিয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেখলে অবশ্যই বোঝা যাবে, বাংলা নববর্ষ পালনের এই ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে একটা গুণগত এবং পরিমাণগত অর্থনৈতিক মাত্রা যুক্ত হয়েছে। আজ থেকে বিশ বছরেরও বেশি আগে বাংলা একাডেমীর সীমানা-দেয়ালের বাইরে মাটির ওপর ছড়িয়ে রাখা পসরার এক বিক্রেতা আমাকে জানিয়েছিলেন, সারা বছরে তিনি যত কুলো বানান এবং বিক্রি করেন, তার অর্ধেকেরও বেশি উৎপাদনের উপলক্ষ হল এই বাংলা নববর্ষ। বোধ করি, অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যাদি যেমন, তালপাতার পাখা, বাঁশি, কাঠের ছোটখাট নিত্যব্যবহার্য চামচ, মাটির চালুনি ইত্যাদির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

টেলিভিশনের কথাটা আবার উল্লেখ করতে হয়। দেখেছি ঠিক ঈদের সময় যেমন হয়, তেমনি নববর্ষের সাত দিন আগে থেকে সংবাদ পরিবেশনার সময় বৈশাখী কেনাকাটার টুকিটাকি নিয়ে সব টেলিভিশন চ্যানেলেই প্রতিবেদকের ছোটাছুটি। সম্পন্ন, উচ্চবিত্ত, মধ্য/নিম্নবিত্তদের বৈশাখী উদ্‌যাপনে যেমন বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজের বিপণন চিত্র দেখা গেছে, ডিজাইনারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে, তেমনি সংবাদ সংগ্রাহক ছুটে গেছেন রায়ের বাজারের কুমোর পাড়ায়, মুন্সীগঞ্জের পটচিত্র আঁকিয়েদের কাছে, হস্তশিল্পের সুখ্যাতি আছে এমন সব গাঁও-গেরামে। ঢাকার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত দোকানগুলিতে যেসব মহার্ঘ পোশাক-আশাক বিক্রি হচ্ছে, তার সুতোর কাজ, সেলাই-এর কাজ করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন মফঃস্বল এলাকায়। একদম ঠিকঠাক ঈমানদার মজুরি পাবে কি না, এই প্রশ্নটাকে আমি গৌণ করে দেখতে চাই। পাটচাষী, ধানচাষী, আলুচাষী, মুরগির খামারী প্রভৃতি শ্রমজীবীরাও তো ন্যায্য দাম, ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। তা নিয়ে থেকে থেকেই তো সংবাদমাধ্যমে খবর পরিবেশিত হয়, তাই এসব বিতর্ক তুলে পহেলা বৈশাখের নববর্ষের আনন্দে আমি ছিদ্র খুঁজতে চাই না।

এবার পহেলা বৈশাখের প্রাক্কালে আমাদের দেশের সর্বাধিক প্রচারিত একটি দৈনিকে একটা জরিপ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, শুধু ঢাকার পোশাকের দোকানগুলিতে বিক্রিবাটার পরিমাণ ঈদ উৎসবের চেয়ে বেশি। এই তথ্য ও সত্য আমাকে, আমার মত কোটি মানুষকে পুলকিত ও আলোড়িত করে। অনুমান করি, টিভির সংবাদে যেমনটি দেখেছি, তাতে মেয়েদের সাজগোজের বিভিন্ন সামগ্রীর বিক্রয়ও হয়ত তুলনামূলকভাবে বেশি। আর এখানে যদি সমাজতত্ত্বের একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আসি, তাতে বৈশাখী উৎসবের ইতিবাচক দিকটা বোধ হয় আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঈদ উপলক্ষে অসৎ ব্যবসায়ী ও আড়তদাররা যেভাবে জিনিসপত্র মজুদ করে রেখে বাজারে দাম বৃদ্ধি ও নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে উঠেন, বাংলা নববর্ষের বেলায় তা ঠিক তেমনভাবে ঘটে না। ইলিশের আকাশ-ছোঁয়া দামের কথা উল্লেখ করে যদি আমার মন্তব্যকে কেউ নাকচ করে দিতে চান, তাদের বলি, চৈত্র-বৈশাখ ইলিশের সময় নয় এবং এই কোটি মানুষের ঐতিহ্যিক স্বাদ মেটানোর ক্ষমতা আমাদের ক্ষয়িষ্ণু নদীরা হারিয়ে ফেলেছে। বৈশাখ যে এই তপ্ত দাবদাহের মধ্যেও বাঙালিকে মেলায় মেলায় মিলিত হবার ডাক দিয়ে যায় সব ধরনের বিভেদকে দূরে ঠেলে দিয়ে, সে-ই আমাদের পরম সাংস্কৃতিক সম্পদ।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. জসীম উদ্দীন

শিক্ষকদের জন্য আহ্বান- চাই মর্যাদা, ন্যায্য অধিকার ও জবাবদিহিতা

Teachers are the single most influential and powerful force for equity, access and quality in education.

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৩ উদযাপনের প্রাক্কালে শিক্ষকদের সম্মান জানাতে গিয়ে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা এমনটাই মন্তব্য করলেন। শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৬ কোটিরও বেশী শিক্ষক ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করছেন। এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে: A Call for Teachers! যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'শিক্ষকদের জন্য আহ্বান- চাই মর্যাদা, ন্যায্য অধিকার ও জবাবদিহিতা'। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে শিক্ষকের প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকাল থেকে শুরু করে কৈশোর উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপে শিক্ষকরা খুবই অর্থবহ অবদান রাখেন। একটি আলোকিত সাক্ষর সমাজ বিনির্মাণে তাই শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা। তবে এর সাথে প্রয়োজন শিক্ষক এবং শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সকলের জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা।

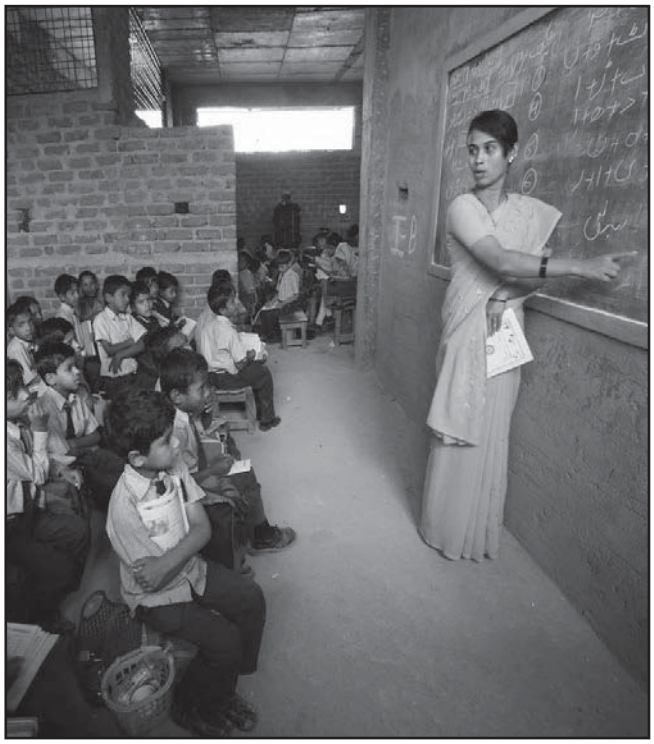

বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের ক্রমাগত প্রচেষ্টা এবং ইউনেস্কো-আইএলওর সদিচ্ছায় ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর অর্জিত হয় শিক্ষক সমাজের পেশাগত অধিকার ও মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবিষয়ক সনদ। ১৪৬ ধারা-উপধারাবিশিষ্ট ঐতিহাসিক এই দলিলের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এডুকেশন ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের অনুরোধ ও আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ২৬তম অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনেস্কোর তৎকালীন মহাপরিচালক ফ্রেডারিক মেয়র প্রতি বছর ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের ঘোষণা দেন।

এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- শিক্ষকদের অধিকার, দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যের সম্প্রচার ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- কার্যকরভাবে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন এবং এ সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ;
- 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষকদের কার্যকর ভূমিকা পালন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ;
- 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা;
- মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অধিকতর প্রশিক্ষিত ও পেশাদার শিক্ষক গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা;

- শিক্ষক সংগঠনগুলোর পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

১৯৬৬ এবং ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক গৃহীত সনদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলো যা শিক্ষক সমাজের পেশাগত অধিকার, মর্যাদা এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও জবাবদিহিতাকে নির্দেশ করে।

- শিক্ষা ও শিক্ষকের স্বার্থে এই পেশায় চাকরির স্থিতিশীলতা এবং চাকুরীকালীন নিরাপত্তা আবশ্যক।
- শিক্ষা উপকরণ ও পাঠ্যবই নির্বাচন, শিখন পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষকতা পেশার স্বাধীনতা থাকবে।
- শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি নির্ধারণে মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহারে শিক্ষকদের স্বাধীনতা দিতে হবে।
- শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষার্থীর মা-বাবার অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে শিক্ষককে রক্ষা করতে হবে।
- শিক্ষকদের বেতন ও কাজের শর্তাদি শিক্ষক সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
- শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
- শিক্ষককে মূল্যায়নের প্রয়োজন হলে তা করতে হবে পক্ষপাতহীনভাবে এবং শিক্ষকের জ্ঞাতসারে।
- নিজেদের মর্যাদা রক্ষার্থে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে শিক্ষককে সচেষ্ট থাকতে হবে।
- শিক্ষা ও সমাজের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষক সংগঠনসমূহের পূর্ণ সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষার্থী এবং বয়স্কদের স্বার্থে শিক্ষাক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশ নিতে শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে।

উল্লেখিত ধারাগুলোর আলোকে আমাদের শিক্ষক সমাজের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনাই এখন বিবেচ্য বিষয়। বিশ্ব শিক্ষক সমাজ যখন যুগোপযোগী ও উন্নত শিক্ষার কথা ভাবছে, তখন আমাদের দেশের শিক্ষক সমাজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করছে। আমাদের শিক্ষকতা পেশার সম্মানজনক অবস্থা না থাকায় মেধাবী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিরা এই পেশায় আসছেন না। আবার কিছু কিছু অযোগ্য ও অশিক্ষক মানসিকতার ব্যক্তি অসাধু উপায়ে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করছেন। ফলে নিম্নমুখী হচ্ছে আমাদের শিক্ষার মান। মর্যাদার পাশাপাশি তাই জবাবদিহিতার প্রসঙ্গটি চলে আসে অনিবার্যভাবে।

শিক্ষার সংক্ষিপ্ত রূপ: বাংলাদেশ ও মৌলভীবাজার পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তিন কোটি শিক্ষার্থী এবং ৯ লক্ষ শিক্ষক রয়েছেন। পাশাপাশি কয়েক শ'বেসরকারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং এনজিও পরিচালিত প্রায় ৫০ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ।

মৌলভীবাজার জেলায় ৬৯২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৬৪টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে যেগুলো জাতীয়করণ করা হয়েছে) এবং চা বাগানে রয়েছে ১০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত মৌলভীবাজার জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৪ জন প্রধান শিক্ষকসহ ১২০৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১১ ও ২০১২ সালে সিইনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে ২৮৮ জন ও ২২৫ জন। ইতিমধ্যে ৭০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬৯২টি প্রধান শিক্ষকের পদের বিপরীতে ৯১টি পদ শূন্য রয়েছে, আর ২৮৭১ জন সহকারি শিক্ষকের পদের বিপরীতে শূন্য পদের সংখ্যা ৪৭ জন। সবকিছু মিলে ৪৭৫৩টি পদের বিপরীতে কর্মরত রয়েছেন ৪৫২৬ জন, শূন্য রয়েছে ২২৭টি পদ। কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীর শূন্যপদ পূরণ করা না হলে শিক্ষকের ন্যায্য অধিকারের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকবে। মৌলভীবাজার জেলায় ৩ শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫১টি ও ৪ শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ১৭৭টি। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকসহ ৬টি শ্রেণী রয়েছে। এমন সীমাবদ্ধতার মধ্যে শিক্ষকের জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত হবে?

মৌলভীবাজার জেলায় ১৮৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭১টি মাদ্রাসা, ২টি কারিগরি কলেজ এবং ২৫টি কলেজ রয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৯৯৭টি পদের বিপরীতে ৪০৫টি পদ শূন্য রয়েছে। মাদ্রাসার ৮১০টি পদের বিপরীতে শূন্য রয়েছে ১৬৬টি পদ, কর্মরত রয়েছেন ৬৪৪ জন। এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক প্রায় এক হাজার প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারিভাবে পরিচালিত কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রায় ২ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

শিক্ষানীতি ২০১০ ও প্রসঙ্গ কথা

সরকারের একটি বড় সাফল্য হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন। তবে শিক্ষা আইন প্রণয়নের পূর্বে এর কয়েকটি ক্ষেত্রে নজর দিলে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। জাতীয় শিক্ষানীতির মুখবন্ধে বলা আছে, শিক্ষার্থীদের তথাকথিত নোট বই, প্রাইভেট টিউশনি প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত আপদ থেকে মুক্তি দিতে হবে। আর এ নীতির বাস্তব রূপ দিতে শুরু করা হয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে বাজার জুড়ে এখন দেখা যাচ্ছে সৃজনশীল

গাইড আর নোটবুকের ছড়াছড়ি। শিক্ষানীতি প্রণয়ন হলে এসএসসি আর এইচএসসির পরিবর্তে জেএসসি ও এইচএসসি চালুর কথা শোনা গেলেও এখন পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি চারটি পরীক্ষা দিতে হচ্ছে ছেলে মেয়েদের। শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে সরকার সারা দেশে ২৪টি স্কুলকে কলেজে রূপান্তর করেছে। এর সবগুলোই বড় বড় শহরে অবস্থিত, পিছিয়ে আছে গ্রামের স্কুল। অথচ এই শিক্ষানীতিতেই আছে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ সহায়তা দেওয়া, যাতে শহর আর গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য কমিয়ে আনা যায়।

শিক্ষানীতির আলোকে ইতোমধ্যে অবশ্য বেশ কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তকরণ, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য বৃত্তি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন, মেয়েদের জন্য উপবৃত্তির হার বাড়ানো, শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকেই বলেছেন, শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ও মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা দুরূহ কাজ, স্থায়ী বেতন কাঠামো গঠনও একটি জটিল বিষয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী চালু হলে এর শিক্ষক কারা হবেন এ বিষয়ে এখনও স্পষ্ট হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী চালু করার মত শিক্ষক এবং অবকাঠামো দেশের ৮০ শতাংশ বিদ্যালয়েরও নেই।

শিক্ষা আইন ২০১৩ ও কয়েকটি সুপারিশ

আইনে শিক্ষক বলতে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে খসড়া শিক্ষা আইন ২০১৩ কে আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ইতোমধ্যে খসড়া প্রস্তুত করে মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানের তারিখ প্রথমে ২৫ আগস্ট এবং পরবর্তীকালে ১০ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়। নবম জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশনে এটি পাস করার পরিকল্পনা ছিল। খসড়া চূড়ান্ত হবার পর আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ, বিল আকারে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অনুমোদন, সংসদে উঠার পর বিলটি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক- এত কিছুর পর সহসা শিক্ষা আইন ২০১৩ আলোর মুখ দেখবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

শিক্ষা আইনে যাতে কোন অবাস্তব বিষয় অন্তর্ভুক্ত না হয় সেদিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষকদের শাস্তির বিধান, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে একতরফা বেতন কর্তন ইত্যাদি শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদার পরিপন্থী হবে কি না এবং সর্বোপরি এটিকে একটি জাতীয় ইস্যু বিবেচনা করে শিক্ষা আইন ২০১৩ পাস করা উচিত হবে বলে বিজ্ঞজনেরা মত প্রকাশ করেছেন। আইনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে

১. **শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন:** লন্ডন ও সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অথবা জাপানের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা নিয়ে যাবতীয় কার্যক্রম দেখভাল করার জন্যে জাতীয় শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

২. **এডুকেশন বোর্ড রিক্রুটমেন্টস অথরিটি (ইবিআরএ):** ডেপুটেশন প্রথা রহিত করে এডুকেশন বোর্ড রিক্রুটমেন্টস অথরিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৩. **স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (এলইএ) গঠন:** ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেই এলইএ রয়েছে, যারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিবিড়ভাবে শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে পারেন। শিক্ষা আইনে এলইএ'র বিধান রাখা জরুরি।

শিক্ষা ও শিক্ষকের কিছু বাস্তব অবস্থা

শিক্ষকদের অধিকার সংরক্ষণ ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে শিক্ষক সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন যাবত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্যারিস ঘোষণার ৪৫ বছর পেরিয়ে গেলেও শিক্ষকদের অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। শিক্ষক স্বল্পতা তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে শিক্ষক সংগঠনগুলোকে কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। তাই চার দশকের অধিক সময় পরেও বাংলাদেশে শিক্ষকের মর্যাদা সংক্রান্ত ঐ সুপারিশসমূহ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে, বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষকগণ সুপারিশকৃত মর্যাদাকে এখনও স্বপ্ন হিসেবে বিবেচনা করেন। মানসম্মত শিক্ষা প্রদান ও আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষকতা পেশা এখনও বাংলাদেশে তেমন জনপ্রিয় না হওয়ায় অনেক কৃতী শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে এই পেশায় আসতে চায় না।

শিক্ষকতার পেশাকে আকর্ষণীয় করে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে এই পেশায় উদ্বুদ্ধ করা, পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের পেশাগত মান উন্নয়নে শুরুতেই যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ ও তা অব্যাহত রাখা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার

অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ (Monitoring) ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এসব সুপারিশের অনেকগুলো বাস্তবায়িত হলে শিক্ষকদের যেমন মর্যাদা বাড়বে, তেমনি শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে। বিশ্ব শিক্ষক দিবস শুধুমাত্র শিক্ষকদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের কথাই বলে না, বরং আগামী প্রজন্মের মানসম্মত শিক্ষার কথা চিন্তা করে শিক্ষকতা পেশাকে আরও আকর্ষণীয় করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও বলে।

আইন ও শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজি মাধ্যমের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, আলাদাভাবে বলা হয়নি ক্যাডেট কলেজ সম্পর্কেও। তার মানে কি এই যে, পদ্ধতি দু'টো বাতিল হয়ে গেছে?

সরকার শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেলের কথা বলেছে, এটা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে আশান্বিত করে তোলে। যদি শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল প্রবর্তন করা হয়, তবে তা দেশের সরকারি-বেসরকারি সব পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য হতে হবে। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো শিক্ষা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের কার্যকরী ও স্থায়ী ব্যবস্থা।

শিক্ষকদের জন্য আরেকটি অশুভ দিক হলো শিক্ষাঙ্গনে দলীয়করণ। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শুরু হয় দলীয়করণের প্রতিযোগিতা। যার ফলে কেবল দলীয় স্বার্থ বিবেচনা করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক নিরপরাধ শিক্ষককে হয়রানি এমনকি চাকুরিচ্যুত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চাইলে এখানে ক্ষমতাসীন দলের শক্ত সমর্থন নিয়ে তবেই আসতে হবে। যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে যে কেউ সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন, যদি তার থাকে শক্ত রাজনৈতিক খুঁটি। ভিসি থেকে শুরু করে অনেক পদের নিয়োগই এখানে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

পরিমল অথবা ইমাম হোসেনদের মতো শিক্ষকদের দ্বারা যখন কোমলমতি ছাত্রীরা লাঞ্ছিত হয় তখন পুরো শিক্ষক সমাজের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এ ধরণের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঘটনা ঘটার আগেই শিক্ষক সংগঠন এবং প্রশাসন কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশন, মজিদ খান হয়ে শামসুল হক কিংবা মিঞা কমিশন এবং সর্বশেষ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সমর্থিত পিআরএসপি ও ড্রাফট রিপোর্ট- সব ক্ষেত্রেই শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ছাত্র বেতন বাড়িয়ে এবং শিক্ষকদের বাড়তি রোজগারের উপায় বাতলে। শিক্ষা তাহলে কিনেই নিতে হবে।

সিভিল সোসাইটি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ

- শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের মর্যাদা, প্রণোদনা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন।
- মৌলিক শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের পর্যাপ্ত বিনিয়োগ।
- শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি-এর বাইরে অতিরিক্ত কোন ফি না নেওয়া এবং শিক্ষার ঢালাও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশের আলোকে রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ঝরে পড়া রোধে শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রশিক্ষক পুল গঠন।
- শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।
- মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকদের অধিকতর প্রচেষ্টা।
- অগ্রাধিকারভিত্তিতে চা-বাগান, চর, হাওর, দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলসহ সকল বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ঘোষণা অনুযায়ী স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কমিশন গঠন।
- অবিলম্বে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার্থীদেরকে কোন প্রকার শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না, এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের রায়কে অনুসরণ করতে হবে।
- তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবমাননারোধে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শুধুমাত্র শিক্ষক নয়, শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির জন্য ন্যূনতম ৫% বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারিদের বদলীজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- দক্ষতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ এনজিওদের সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করলে মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক বড় মাত্রার অগ্রগতি অর্জিত হতে পারে।

- জবাবদিহিতার স্বার্থে স্থানীয় সমাজ ও অভিভাবকদের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা।
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় 'ডেপুটেশন' সংস্কৃতির পরিহার।
- ডিজিটাল কন্টেন্ট-এর মাধ্যমে ক্লাস নেয়ার সুবিধার্থে সকল শিক্ষকের হাতে সরকারি উদ্যোগে সহজ কিস্তিতে একটি করে ল্যাপটপ দেয়া যেতে পারে, যা পরে শিক্ষকের বেতন থেকে খুব অল্প অল্প করে কেটে নেয়া যায়।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুসারে মান ও সমতাভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য তৃণমূল পর্যায় থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম ও বাজেট তৈরি এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।
- শিক্ষাব্যবস্থা একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ বা শিল্প কারখানা। এই কারখানার প্রাণভোমরা হচ্ছেন শিক্ষক। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বত্র এক না হলেও চলে, হলেও আপত্তির কিছু নেই। শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে যে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হওয়া উচিত ন্যূনতম যোগ্যতা; এর চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ এলে তার গ্রেড ভিন্ন হলে অনেক যোগ্যরাও এ পেশায় আসবেন।

একজন প্রাজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষক সমাজ বদলে দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন বলেই শিক্ষকতা পেশায় অধিক মেধাবীদের আকৃষ্ট করা ও তাদের ধরে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে এখনই। শিক্ষকতা পেশা অতি প্রাচীনকাল হতেই অত্যন্ত সম্মানের বিবেচিত হলেও শিক্ষকদের করুণ ভাগ্য আজও বদলায়নি। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন। ২০১৪ সালের মধ্যে ১০০ ভাগ সাক্ষরতা আমাদের লক্ষ্য। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত দেশ আমাদের পরিকল্পনা। এসবই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি। এগুলো বাস্তবায়নে বাড়াতে হবে শিক্ষকদের জন্য বিনিয়োগ। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ ও শিক্ষাদাতা শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা যতদিন প্রতিষ্ঠা করা না যাবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তত পিছিয়ে যাবে। যে কোনো মূল্যে শিক্ষকতা পেশায় অযোগ্যদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে। গুণগত শিক্ষার জন্য যোগ্য, দক্ষ, মেধাবী ও নীতিবান শিক্ষকদের আকৃষ্ট করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে ইউনেস্কো-আইএলও সনদের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ এবং অধিকার ও মর্যাদা।

মো. জসীম উদ্দীন
জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা
মৌলভীবাজার

[বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মৌলভীবাজারে ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে আয়োজিত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।]

পাঠক-লেখক-শুভানুধ্যায়ী *সমীপেষু–*

সাক্ষরতা বুলেটিন-এর প্রকাশনার প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আপনাদের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষণা। আর তা আমরা বিরতিহীনভাবে পেয়েছি বলেই বুঝতে পারি, এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনার যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষা এবং জনসচেতনতা সৃজনে সহায়তা– তার কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে। আমরা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে, আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আরো এগিয়ে যেতে চাই।

তাই আগামী সংখ্যা থেকেই আমরা যুক্ত করতে চাই একটি নিয়মিত বিশেষ বিভাগ,– 'পাঠকের পাতা'। এই পাতায় আমরা প্রকাশ করতে চাই *বুলেটিন* সম্পর্কে আপনাদের বিভিন্নমাত্রিক অভিমত, প্রত্যাশা এবং শিক্ষা-সাক্ষরতার সেইসব দিক সম্পর্কে আপনাদের ভাবনা, যা হয়ত আমরা এখনো এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। আপনাদের সমালোচনাও আমাদের পাথেয় হয়ে উঠবে। যদি কলেবরের ওপর প্রবল চাপ না পড়ে তাহলে আপনাদের পূর্ণাঙ্গ অভিমত আমরা কেবল ভাষাগত সম্পাদনাসহ ছেপে দেবো।

অধিকন্তু, এই কয়েক বছরে আমাদের পত্রিকা পাঠ করে আপনারা যে ধারণা অর্জন করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি স্থানীয় কোন শিক্ষা-সমস্যা ও সম্ভাবনাভিত্তিক লেখা পাঠান, তা প্রকাশ করতেও আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখার সঙ্গে ছবি পাঠালে তাও আমরা মুদ্রিত করতে চাই। এ বিষয়ে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করি।

সম্পাদক

ড. খন্দকার নেছার আহ্‌মেদ

বাংলার আবহমান স্মৃতিতে চিরভাস্বর: বাংলা নববর্ষ

আবহমান কাল থেকে গ্রামীণ ও শহরে জনপদে বহুল আলোচিত, চির-লালিত ও ঐতিহ্যময়ী লোক-সংস্কৃতি ধন্য প্রাচীন উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-বাংলা নববর্ষ বা পয়লা/১লা বৈশাখ । তাই, এ বৈশাখের আগমনী শোন যায় ১লা বৈশাখের প্রাক্কালে ঐতিহ্যবাহী, চির-অম্লান ও চিরায়ত গানের সুমধুর মূর্ছনা ও সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়ার অনুসরণে।

এসো হে বৈশাখ,
এসো এসো-----অথবা
ঐ নুতনের কেতন ওড়ে
কালবৈশাখী ঝড়,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে গোটা দেশে পালিত হয়ে থাকে। এটি বাঙালীর জন্য এক শ্বাশ্বত ঐতিহ্যময় একটি বর্ণ্যাঢ্য দিন। তাই আনন্দঘন পরিবেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাসহ সর্বস্তরের জনগণ এ দিনটিকে সাদরে বরণ করে নেয়।

মহান মোগল সম্রাট আকবর-এর আমল থেকে বাংলা নববর্ষের সূচনা হয় এবং বাংলা সনের প্রতিষ্ঠাও হয় সেই সময় থেকে। সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। কিন্তু ইদানিং বাংলা নববর্ষ পালিত হয় এক ভিন্ন আঙ্গিকে ও সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে ও অলঙ্করণে। নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য মিছিল, বৈশাখী মেলা ইত্যাদির। বাংলা বর্ষবরণের সবচেয়ে জমজমাট আয়োজনের সমাবেশ ঘটে রাজধানী ঢাকার রমনার বটমূলে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদেও ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত সহযোগিতায় তা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এখানে বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠানগুলো এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে এবং এক মিলন মেলায় পরিণত হয়, যা সবার নজর কাড়ে।

নববর্ষের দিন কাক-ডাকা ভোরে রমনার ঐতিহ্যবাহী বটমূলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনী গান, "এসো হে বৈশাখ এসো এসো" এর মাধ্যমে বাংলার চির-লালিত নতুন বর্ষকে বরণ করা হয়। চারুকলা অনুষদের প্রথিতযশা চারুশিল্পীদের রঙিন শোভাযাত্রা নববর্ষের উৎসবকে আরও রঙিন করে তোলে। এ বিশেষ দিনে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ, টি.এস.সি., চারুকলাসহ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিণত হয় এক বিশাল জনসমুদ্রে যা ব্যাপ্ত হয়ে পাশ্ববর্তী এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে ।

পয়লা বৈশাখে ঐতিহ্যবাহী হালখাতা অনুষ্ঠান পালন করে। নববর্ষের দিনে পুরোনো বছরের হিসাব নিকাশ চুকিয়ে নতুন বছরের খাতা খোলা হয়, যাকে বলা হয় হালখাতা। এ দিন ব্যবসায়ীরা এমনকি ছোট-খাটো দোকানদাররা তাদের ক্রেতাদের মাঝে মিষ্টি-মন্ডা বিতরণ করেন বা মিষ্টিমুখ করান। তা ছাড়া, বাংলা নববর্ষ ও চৈত্র সংক্রান্ত উপলক্ষে তিন পাবর্ত্য জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হয় যা পাহাড়িদের সবচেয়ে সাড়া জাগানো ও বড় উৎসব। চৈত্রের তাপদাহে বাংলার সমগ্র উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এবং বাতাসের সাথে ধেয়ে আসে আগুনের দুলকি। তাই চৈত্রের দুপুরকে স্মরণীয় ও বরণীয় করতে প্রখ্যাত নৈসর্গিক কবি বন্দে আলী মিঞার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়--

চৈত্রমাসের দুপুর বেলা ----- আগুন হাওয়া বয়,
দস্যি ছেলে বেড়ায় ঘুরে ----- সকল পাড়াময়,
রোদের আঁচে পুড়ছে মাটি ----- উড়ছে ধুলাবালি,
চারিটি দিক করছে ঝাঁ ঝাঁ ----- আকাশ হলো কালি,
কাকেরা সব ছায়ায় বসে ---- এ দিক সেদিক চায়,
শুকনো গলায় ডাকছে কা কা হঠাৎ উড়ে যায়।

আমরা সবাই ওয়াকিবহাল আছি যে, চৈত্র মাসের শেষ দিনের চৈত্র সংক্রান্তি বা বর্ষ বিদায় এবং ১লা বৈশাখ বা বৈশাখের ১ম দিনকে নববর্ষ নামে অভিহিত করা হয়। তাই চৈত্র সংক্রান্তি বর্ষ বিদায় অনুষ্ঠানের পরদিনই নববর্ষকে সাদরে বরণ করা হয় যা বর্ষবরণ নামে ইদানিং সমধিক পরিচিত লাভ করেছে। পুরাতন বছরের জরা-গ্লানিকে, যত চাওয়া-পাওয়ার ও না-পাওয়ার বেদনাকে ঝেড়ে ফেলে আগের বছরকে বিদায় জানানো হয় বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তদরূপ অনেক প্রাপ্তির আশা নিয়ে, পুরানো বছরের যে সব লালিত আশা বা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে নাই সেসব পূরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা নূতন বছর বা নববর্ষকে সাদরে-সম্ভাষণ জানানো হয়। বর্ণিল, এবং বাঙময় আদিবাসীর তথা আঞ্চলিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, নাচে-গানে, নববর্ষকে রাঙিয়ে তোলার যেন এক মহাযজ্ঞে নামে গোটা বাঙালী জাতি। যার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিত্ত-চাঞ্চলে, নতুন পোশাক পরার ধুম পড়ে যায় ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের মাঝে, সেই কাক-ডাকা ভোরে সর্বস্তরের মানুষের সরব পদ-চারণায় রমনায় বটমূল তথা এর আশ-পাশেই আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয় এক অপরূপ মায়াজালে। সবার মুখে এক অনাবিল হাসির ঝলক লেগে থাকে-যা সচক্ষে না দেখলে সত্যিই উপলব্ধি করা যায় না। নববর্ষকে কেন্দ্র করে ফেরিওয়ালা বা ছোট ছোট দোকানিরা বেশ পুঁজি লাভে সমর্থ হয়।

হালখাতা প্রসঙ্গে এক সরস বাস্তবতা উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। আর তা হলো- আমাদের গ্রামের বাড়ির পার্শ্বেই এক ছোট-খাটো মুদির দোকানী ছিলেন এবং গ্রামীণ জনপদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন, কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, লবণ, হলুদ, ডাল, সোয়াবিনের তেল, চাল-আটা, মসল্লা, দিয়াশলাই, গুড়, চিনি ইত্যাদি নানা রকমের জিনিসের পসরা সাজিয়ে গ্রাম্য হাটগুলোতে ভাড়া করা লোকের দ্বারা দোকানের মালামাল নিয়ে যেতেন। তিনি গ্রামের গরীব লোকদের কাছে প্রচুর পরিমাণে ধারে বিক্রি করতেন। এ হালখাতার শুভদিনে তথা পয়লা বৈশাখে তিনি নিজের বাড়ীতে জিলাপি ও রসগোল্লা তৈরী করার পারদর্শী লোক নিয়ে আসতেন। যাঁরা তার দোকান থেকে সওদা নিতেন জিলাপি ও রসগোল্লা দিয়ে লোকদেরকে এ হালখাতার দিনে আপ্যায়ন করাতেন।

"সে দিন হয়েছে বাসি"-এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমাদের সময়ে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী হিসেবে ছাত্রাবস্থায় বহুল পঠিত 'Superstitions' নামক ইংরেজী প্রবন্ধের "The forms change but the substance remains"- কথা হঠাৎ করে মানসপটে উদিত হলো অর্থাৎ বর্তমানে শুভ নববর্ষের এরূপ হালখাতার দিনে আমার উপরোক্ত লেখনীতে বিধৃত মানুষকে খাওয়ানোর ধরনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের স্বভাব চরিত্র ঠিক আগের মতোই রয়েছে- যা একটু আগেই ইংরেজী প্রবন্ধের বর্ণিত অপূর্ব সারবৃত্তীয় মিলে খুঁজে পাওয়া খুব একটা দুষ্কর হবে না বৈকি। আরও একটি কথা, যা বর্তমান ১৪২০ সালের শুভলগ্নে সমভাবে ধ্বনিত হচ্ছে, আর তা হলো, নববর্ষে যেন আমাদের চেতনা ও বিশ্বাসে নুতনভাবে উদ্ভাসিত হয় এক অনাবিল ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর অটুট বন্ধনে যা কিনা বন্ধ করতে পারে ইদানিং-সংঘটিত হানাহানি কাটাকাটি পরিস্থিতি এবং সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির এক অমোঘ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

নববর্ষকে সাদরে বরণ ও আলিঙ্গন করার রেওয়াজ আমাদের দেশে বহু যুগ আগে থেকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার ঐতিহ্য রয়েছে। এ দিনে দেশের সকল মানুষ যেন হিংসা-বিদ্বেষ, সকল সংঘাত ভুলে গিয়ে একই সূত্রে গ্রথিত হয় এবং একে অপরকে কাছে টেনে নেয়। শুভ নববর্ষ বা ১লা বৈশাখ নববর্ষের মধ্যে জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। এ দিনে বিশাল জনসমুদ্র যেন এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। তাই বাঙালি জাতিকে বিনে সুতার মালায় গেঁথে দিতে নববর্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। বছর খানেক আগে বাংলা একাডেমী মোবারক হোসেনের সম্পাদনায় (সহকারী সম্পাদক: কুতুব আজাদ) একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত মোট ৮৭টি রচনার একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সাদৃশ্য সংকলন। বইটির নাম, "বাংলাদেশের উৎসব- নববর্ষ"। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা প্রতিক্রিয়া থেকে লেখা এই সংকলনে যেসব রচনা সংকলিত হয়েছে, সেগুলি অনুধাবন করলেই একথা প্রতীয়মান হয় যে, নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ বা বঙ্গাব্দের প্রথমস্য দিবস আমাদের জীবনে কী ব্যাপক এবং অপরিমেয় তাৎপর্য বহন করে ।

নববর্ষের সাথে নবান্নের এক অদ্ভুত মিল ও নাড়ির টান লক্ষ করা যায়। নবান্ন বা কৃষককুলের ধানক্ষেত থেকে নূতন ধান কেটে আনার পরে তা মাড়াই ও চাল কলে ভাঙ্গানোর পর সে ১ম চাল দিয়ে ভাত/পায়েশ /ক্ষীর রান্না করে গ্রামের মসজিদের ইমাম/মুয়াজ্জিন সাহেব কিংবা গ্রামের অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক/ভিখারিনীকে পেট ভরে খাওয়ানোর পরে বাড়ীর বাবা মা, ভাই-বোনসহ সকলে নবান্ন দিয়ে সুস্বাদু মাংসের ভাত ও পায়েশ-

ফিরনী খাওয়ার রেওয়াজ আমাদের শৈশবকালে চালু ছিল -যার দেখা আজকাল আর গ্রাম-বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাদামাঠা মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়াও ভার। দারিদ্র-তাড়িত ও অধুনা তথাকথিত ইন্টারনেট বা আকাশ সংস্কৃতিতে সেই নবান্ন এখন প্রায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে বললেই চলে।

যাক, সে সব কথা নববর্ষের সাথে আরও ১টি বিষয় আমাদের গোটা বাঙালীর গ্রামীণ-সমাজ জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর তা হলো-নববর্ষ উপলক্ষে সাবলীলভাবে উদযাপিত গ্রাম্য মেলা।

মেলার আক্ষরিক অর্থ মিলন। এ গ্রাম্য মেলা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বেশেষে সবার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে এবং সে আনন্দ সবার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে যা মানুষের পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ অবসরকালীন সময়ে চিন্তার খোরাক হিসেবে কাজ করে। এ মেলা পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও ভাব-মিলনের সংযোগ সেতু রূপে পরিগণিত হয়। তাই বাংলার সংস্কৃতিতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই গ্রাম্য মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতেই এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে খোলা মাঠে, মন্দির প্রাঙ্গণে নদীর তীরে অথবা বড় বট বৃক্ষের নিচে এরূপ মেলা বসতে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের শহুরে জীবনে এ চিত্র একেবারেই ভিন্ন-যার বিবরণ এ নিবন্ধের প্রথম দিকে আমাদের সবার চিরপরিচিত বটমূলের ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু-কারুকলা ইন্সটিটিউট-এর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও র‍্যালী প্রভৃতিতে দেখা যায়। এ মেলায় সাময়িকভাবে দোকান-পাট বসায় চালা নির্মাণ করা হয় এবং মেলা শেষে এগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। নববর্ষের মেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষ, ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নিম্ন নির্বিশেষে প্রাণের টানে সকলে এসে মিলিত হয়। সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে সকলেই যেন এক আনন্দের ভেলায় গা ভাসায়। মেলাকে আশ্রয় করে গ্রামীণ মানুষের আনন্দ-উৎসবের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রীর পসরা নিয়ে আসে। এ মেলায় কোথাও খেলনা, কোথাও ডালা-কুলা-চালুনি, কোথাও কাঠের জিনিস-পত্র, কোথাও মাটির জিনিস-পত্র, কোথাও বিচিত্র স্বাদের খাবারের দোকান বসে। এ ধরনের মেলায় মূলত দু'টি বিষয় কাজ করে। মনস্তাত্ত্বিক দিক হলো: ভাবের আদান-প্রদান আর অর্থনৈতিক দিকটি হলো: পণ্য বিকিকিনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বেদনা নিয়েই তো স্বাধীনতার অর্জনকে সগৌরবে পালন করি প্রতিটি ছাব্বিশে মার্চ ও ষোলই ডিসেম্বর। পালন করবে আমাদের অনাগত প্রজন্ম। তাই যারা বাঁকা চোখে, একথা বলার চেষ্টা করেন যে, আহা নববর্ষের সঙ্গে কৃষকের ধান উৎপাদন ও জীবন ধারণের যোগ ছিল, সেসব পাশে ঠেলে, পহেলা বৈশাখ এখন একটা নাগরিক উৎসব হয়ে উঠেছে, ঢাকা এবং অন্যান্য শহরের উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নববর্ষ পালনের একটা অভিনব রেওয়াজ শুরু করেছেন, এর মধ্যে একটা সাড়ম্বর দেখানোপনা আছে, উৎকেন্দ্রিকতা আছে, ভূমিজ সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগটা অনেকাংশই আলগা। তাদের জন্য আমার/আমাদের সদুত্তর আছে। একটা খুবই জনপ্রিয় অভিযোগের কথা যে, পহেলা বৈশাখের আশেপাশের দিনগুলিতে ধ্বনিত হয়। আমরা ঘটা করে মহা ধুম-ধামে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটা পালন করে থাকি। দিন দশ-বারো পরে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় আজ বাংলা সনের কত তারিখ- সে আর তখন সঠিক উত্তর দিকে পারে না। যদি প্রয়োজনটা খুবই জরুরি হয়, তখন তাড়াহুড়ো করে খুঁজি খবরের কাগজ, সেখান থেকে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করি। বাংলা তারিখ নিয়ে আন্দাজ করার একটা মৌলিক সুবিধা আছে; বাংলা মাসের আরম্ভ খ্রিস্ট্রীয় সনের মাসগুলোর মোটামুটি মাঝামাঝি-১৪, ১৫ বা ১৬ তারিখগুলোতে। সে হিসেবে যে অনুমান-নির্ভর দিন ঠিক করা যায়, তা অনেক সময়ই মিলে যায়। বাংলা সালের হিসেবের বিষয়ে এই যে, আমাদের অমনোযোগিতা, বাস্তব বিচারে প্রয়োজনহীনতা তার নেপথ্যের যে ইতিহাস, তার সঙ্গে জড়িত আছে উপনিবেশবাদ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে, পঞ্জিকা ও নববর্ষ বিষয়ে আমাদের আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে উত্তর-উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা যেতে পারে ।

বাংলা পঞ্জিকা, সাল আর মাসের হিসেব, বাস্তবিক অর্থেই আমাদের নিত্যদিনের জীবন পরিচর্যার সঙ্গে আর তেমনভাবে জড়িত নয়। নববর্ষের প্রথম দিন, আর রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করি শুধু আমরা বাংলা সালের হিসেবে। তাও আবার খেয়াল করলে বোঝা যাবে নজরুলের জন্ম দিবসটা এগারোই জ্যেষ্ঠ মেনে পালন করছি বটে, কিন্তু মৃত্যুর দিনটার বেলায় স্মরণ করি খ্রিস্ট্রীয় বর্ষপঞ্জী মেনে। আমাদের জাতীয় জীবনে ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরম গৌরবময় দিবস-একুশে ফেব্রুয়ারির কথা তো আমাদের অনায়াসে মনে পড়ে যায়।

তাই, বাংলা নববর্ষকে আমরা সবাই উত্তরোত্তর আনন্দঘন পরিবেশে পালন করার জন্য সচেষ্ট হবো। আর নববর্ষ, যেন আমাদের জাতীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়, তার জন্য সবাই আন্তরিকতার সাথে একযোগে কাজ করে যাব। তাহলে, আমরা সত্যিকারের সুখী সুন্দর দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাব।

ড. খন্দকার নেছার আহ্‌মেদ
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার, ঢাকা

সা ঈ দু ল আ রে ফী ন

উৎসবে আয়োজনে বাঙালির বৈশাখ

চৈত্রশেষে নববর্ষের প্রথম দিন বা পয়লা বৈশাখ। অন্যরকম একটি দিন। নববর্ষের লাল বাঙালির প্রাণে মনে এনে দেয় ভিন্ন ধরণের এক দ্যোতনা। দুর্দমনীয় চৈত্রের খরাপীড়িত দগ্ধ বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান মুসলমান সকল বাঙালির মনে বৈশাখ আসে বর্ণিল উৎসবের অমৃত সুধা ছড়িয়ে দিয়ে। বাঙালি উৎসবমুখর জাতি।

হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালির প্রাণের উৎসব বৈশাখী উৎসব। বর্ষ বিদায় আর বর্ষবরণের পেছনে রয়েছে নানা রকম ইতিহাস, উদ্দীপনা ধর্ম বর্ণ আর সংস্কৃতির মাঝে মহা সম্মিলনের এক বার্তা। উৎসব হলো একটি প্রাচীন সাংস্কৃতিক রীতি, সামাজিক সংহতি সৃষ্টি এবং সমবেতভাবে বিনোদনে অংশগ্রহণ। উৎসবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে আমাদের ঐতিহ্য। বাংলা নববর্ষকে ঘিরে আমাদের চলমান ইতিহাস ঐতিহ্য ও সমাজ সংস্কৃতির মাঝে অনেক ধরণের কথা বার্তা প্রচলিত আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, গ্রামে গ্রামে যে উদ্দীপনায় বৈশাখ উদযাপিত হতো তখন গ্রামে গ্রামে মেলা হতো, হতো গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, গম্ভীরা গান, যাত্রা, জারি, সারি, কবিগান। আর এসব কিছু নিয়েই চলতো উৎসবের আয়োজন। এখনো আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ফিরে মেলা বসে। সেই মেলা থেকে সারা বছরের প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সংগ্রহের তাগিদটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখনো এ ধারা বহমান ।

বাংলা নববর্ষ পালনের মূলে আছে কৃষি। আগে বছর গণনার ভিত্তি ছিল চন্দ্রকলা। পরে ফসল বোনা ও কাটার বা কৃষির কারণে চন্দ্র ও সূর্যের উৎসবভিত্তিক গণনা শুরু হয়। পরে ঋতুর পরিবর্তন দেখেই পালিত হচ্ছে নববর্ষ। এটি এমন একটি উৎসব যা হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধের একক কোনো উৎসবের দিন নয়। এর চরিত্র সার্বজনীন। জানা যায়, পৃথিবীর নানাদেশে উৎসবকে ঘিরেই নববর্ষ পালনের রেওয়াজ চালু হয়েছে।

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায় পালন করে বিজু বা বৈসাবি উৎসব। এই বৈসাবি উৎসব বৈশাখি সাংগ্রাই বা বিজু তিন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন উৎসব একই আঙ্গিকে বৈচিত্র্যধর্মী মাত্রা যোগ করে। বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষকে ঘিরে আবর্তিত বৈশাখী মেলা ও উৎসবের আয়োজন হয়ে ওঠেছে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য, যা মানুষে মানুষে কালো সাদা সকল বর্ণ গোত্রকে এক করে সারাদেশের গ্রাম প্রান্তর ছড়িয়ে দিয়ে এক অমিয় সুধা ছড়িয়ে দিয়েছে বাঙালির মনে প্রাণে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর ভর করে বাংলা নববর্ষ ও বৈশাখ খুঁজে পেয়েছে নতুন বার্তা। যেমন রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত কথমালায় বৈশাখের ঘুম ভাঙা সকালে শিল্পীরা গেয়ে ওঠেন

এসো এসো, এসো হে বৈশাখ
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।

ঠিক সেভাবেই নজরুলের বৈশাখ বরণের জয়ধ্বনি প্রকাশ পায় কবিতায় গানে-

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কালবৈশাখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

বাঙালি সংস্কৃতিতে বৈশাখী মেলা ও উৎসব যেন নূতন আবহ ও ভিন্ন এক দ্যোতনার সমারোহ। এই মেলা ও উৎসব বিগত কয়েক বছর ধরে বাঙালি সংস্কৃতিকে জাগিয়ে দিয়েছে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে। জানা যায়, একসময়ে পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা প্রচলনের পর জমিদারি স্টেটে পুণ্যাহ এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে হালখাতা বিষয়ক প্রথা প্রবর্তিত হয়, যা পার্বত্য অঞ্চলে আজো দেখা যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও থেমে থাকেনি এইসব ধারাগুলো।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশের ক্রমবর্ধমান ধারা পূর্ণমাত্রা লাভ করে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ব বাংলায় নির্বাচনে জয়লাভ করে বাংলা নববর্ষকে সাধারণ ছুটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এতে করে সারা বাংলা জুড়ে শহর পেরিয়ে বন্দর গ্রাম গঞ্জ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এর আনন্দ।

১৯৬৭ সন থেকেই ঢাকার রমনা বটমূলে ছায়ানটের সূচনায় নববর্ষ উদযাপনের বহুমাত্রিকতা ব্যাপকভাবে সারাদেশে আলোড়ন তোলে। বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষের মনে বৈচিত্র্যপূর্ণ এক ভাবধারা তৈরি হয় ওই সময়ে। সকল ধর্মের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবে পরিণত হয়।

নববর্ষের উৎপত্তি ও বিকাশ

বেশির ভাগ বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞের মতে মোগল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তক। সম্রাট আকবর সিংহাসনের আরোহনের পর হিজরি ৯৬৩ সালে বাংলা নববর্ষের সূচনা হয়। এ সময় তাঁর বিজ্ঞ রাজজ্যোতিষী আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজীকে নির্দেশ দিলে তিনি সবিশেষ পরিশ্রমের মাধ্যমে হিজেরী সন বা চন্দ্র বৎসরকে বুদ্ধিমত্তার সাথে সৌর বৎসরে পরিণত করেন। মূলত এর সূচনা হয়, ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের পর থেকে। তারই ধারাবাহিকতায় চান্দ্র বৎসরের সাথে মিল রেখে অত্যন্ত সুকৌশলে ১৫৮৪ খৃস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ এ ফসলী সন বা বাংলা নববর্ষের উৎপত্তি ঘটে, যা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়। এর মাধ্যমেই ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে যাত্রা শুরু করে বাংলা সন। যার শুরুটা ছিলো পয়লা বৈশাখ দিয়ে।

জানা যায়, এ ফসলী সন চালুর পর থেকে কৃষিকাজ নির্ভরতাকে কেন্দ্র করে গ্রাম গঞ্জের ব্যবসায়ীরা হিসাবের খাতা খুলতেন নববর্ষের শুরুতে। এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে খাজনা আদায়ের সূচনা মাস হিসেবে। অন্যদিকে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্মিলনের ফলে এই বাংলা শব্দটি পেয়ে যায় ব্যাপকতা। আকবরের আমলে প্রচলিত বাংলা বর্ষের শেষ দিকে বা চৈত্র মাসে ভূস্বামীরা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। জমিদারি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রথা বলবৎ ছিলো। তবে আমাদের সরকারি ব্যবস্থাপনাতে এখনো ভূমির খাজনা আদায় করা হয় বাংলা সন তারিখ ধরে। হিসাবও সেইভাবে প্রচলিত আছে।

চৈত্রশেষে সংক্রান্তি

বাংলা নববর্ষের আরেক নান্দনিকতা ছড়িয়ে উৎসবমুখরতা নিয়ে আসে চৈত্রশেষে সংক্রান্তির মেলা আয়োজনের মাধ্যমে। চৈত্রের শেষ দিনে আমাদের প্রতিটি অঞ্চলে চারিদিকে শোরগোল, মেলা ও খেলার আয়োজন থাকে। সবচাইতে বড়ো ব্যাপার হলো, চৈত্রের প্রথম প্রহর থেকে ঘরদোর ঝেড়ে মুছে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলা হয়। এই দিনে গ্রাম গঞ্জে নানা মেলা ও খেলার আয়োজন হয়ে থাকে। নানা চিত্তবিনোদনের পসরায় ব্যাপৃত চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ও মঞ্চের আনুষ্ঠানিকতায় থাকে নাচ, গান, নাটক। উৎসব মুখরতার আমেজ এ দিনেই জনগণের মধ্যে সূচিত করে বর্ষবরণের আগাম সংকেত। সারা বছরের ক্লান্তি জড়তা মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় এ দিনটিকেও বাঙালি স্মরণীয় বরণীয় করে রাখে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনসহ সারাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন আড্ডা ও আনুষ্ঠানিকতায় পুরাতন বর্ষকে বিদায় জানায় এ দিনে। তবে আগেকার দিনের গ্রামের রুচি ও সংস্কৃতির সাথে পালাবদল ঘটেছে শহুরে সংস্কৃতির আয়োজনের ভিন্নতায়।

হালখাতা

পুরাতন বছরের হিসাব বন্ধ করে নুতন বছরকে সামনে রেখে পয়লা বৈশাখ থেকে ব্যবসায়ীরা হিসাব নিকাশ করার জন্য লাল কাপড়ে মোড়ানো খাতা খুলে থাকেন হালখাতা হিসেবে। তৎকালীন জমিদাররাই হালখতার প্রচলন করেন। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর হালখাতা আয়োজনে অনেকটা ভাঁটা পড়ে। এখনো হালখাতার জৌলুস বিদ্যমান আছে আমাদের দেশের পুরনো ব্যবসায়ী কেন্দ্র ও স্বর্ণপট্টি গুলোতে। পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজার, তাঁতী বাজার, শাঁখারী বাজার, চট্টগ্রামের হাজারি গলি ও খাতুনগঞ্জসহ এখনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বর্ণপট্টি এবং আড়ত গুলোতে হালখাতার আয়োজন থাকে। ইদানীং ক্রেতাদের দাওয়াত কার্ড বিতরণের পালাও থাকে হালখাতা উৎসবে। থাকে ক্রেতাদের পাওনা পরিশোধের পর্ব। চলে মিষ্টি মুখ করানোর ধুম।

নববর্ষের আমেজ রক্ষা করতে সবার ঘরে ঘরে মিষ্টান্ন না হলে চলে না। উপাদেয় খাবার আর রসনা বিলাসে বাঙালির চিরাচরিত অভ্যাস রক্ষা করতে কোন এক ফাঁকে ইলিশও হয়ে ওঠে নববর্ষের প্রাণ। তবে বৈশাখের ইতিহাসের সাথে এর কোন সম্পর্ক অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবুও নববর্ষে পান্তা ইলিশ আর রকমারি খাবারের আয়োজন নিয়ে বড় বড় শহর গুলোতে নামকরা রেঁস্তোরায় আজকাল হিড়িক পড়ে যায় ক্রেতাদের। সকাল থেকে রাত অবধি যেনো অন্যরকম একটি আবহ কাজ করে নববর্ষের এই দিনটিতে। এমনিতেই উৎসবমুখর এই জাতি বর্ষবরণের বাতাবরণে বাঙালি সত্তার বিকাশ যেন আরো পূর্ণতা পেয়েছে বৈশাখের প্রতিটি অনুষঙ্গে। কী নেই নববর্ষে, গ্রাম গঞ্জের যাত্রা পালা, গম্ভীরা, জারি, সারি, পুতুল নাচ আর রবীন্দ্র নজরুল লালন হাসন ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া গানে মাতোয়ারা হয়ে একাকার হয়ে যায় আমাদের বাঙালিয়ানা। সেই সাথে প্রতিটি সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা, চ্যানেলগুলোতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাদকতায় আবিষ্ট হয়ে যায় গণমানুষ এই নববর্ষে।

সাঈদুল আরেফীন
ম্যানেজমেন্ট এডভাইজার
যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

আ বু রে জা

পহেলা বৈশাখে

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাস বায়ে, মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক ॥
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা ॥
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক ॥

বৈশাখে বাংলা নতুন বছর শুরু হয়। পহেলা বৈশাখে পালন করা হয় নববর্ষ উৎসব। কালপরিক্রমায় এই উৎসব অবশ্য এখন ব্যাপক নাগরিক চরিত্র অর্জন করেছে। এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান লোকউৎসব। এ উপলক্ষে পহেলা বৈশাখে সকল বাঙালি নববর্ষকে স্বাগত জানায়। এ দিনে নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষকে বরণ করে নেওয়া হয়। বাংলাদেশে নববর্ষ হিসেবে আবহমান কাল থেকে এ দিনটি পালন করা হয়। অতীতের গ্লানি, ব্যর্থতা, ভুল-ত্রুটি ভুলে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তি কামনা করা হয় এ দিনে।

আবহমান কাল ধরেই বৈশাখ উপলক্ষে অনেক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এর মধ্যে একটি হলো হালখাতা। আভিধানিক অর্থে হালখাতা মানে হলো নতুন বছরের হিসাবনিকাশের জন্য নতুন খাতা, নতুন খাতায় হিসাব তোলার উৎসব। অতীতে গ্রাম বাংলার হাটে-বাজারে দোকানে দোকানে বৈশাখের প্রথম দিনে হালখাতা উৎসব পালন করা হতো। এ প্রথা বাঙালির জীবন থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি, ধুঁকে ধুঁকে এখনো টিকে আছে।

বাংলা নববর্ষের একটি প্রধান উৎসব হালখাতা। গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের শুরুতে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে পুরানো হিসাবনিকাশ চুকিয়ে নেয়, নতুন বছরের জন্য নতুন করে হিসাবের খাতা খোলে। এ উপলক্ষে তারা নিয়মিত খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানায়। তাদের মিষ্টি খাওয়ায়। খদ্দেররাও পুরানো বকেয়া পরিশোধ করে দেয়। নতুন করে খাতায় নাম লেখায়। এ অনুষ্ঠানকেই বলা হয় হালখাতা।

অতীতে হালখাতা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হতো তালপাতায় পত্র লিখে। কালক্রমে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। মানুষ তালপাতা ছেড়ে কাগজে লিখতে শুরু করেছে। এক সময় দেখা গেছে কাগজে হাতে-লেখা পত্র পাঠিয়ে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। তারপর দূরদূরান্তে দাওয়াত পৌঁছাতে পোস্টকার্ড ব্যবহার করা হতো। পোস্টকার্ডে হাতে লিখে বা লেটার প্রেসে ছেপে দাওয়াত দেওয়া হতো। হালে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুদ্রিত দাওয়াতপত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

আগে ব্যবসায়ীরা হিসাব লেখার কাজে ব্যবহার করতো খেরোখাতা। খেরোখাতা হলো লাল রঙের মোটা কাপড়ে বাঁধাই করা এক রকম খাতা। এ খাতা ঢাউস আকৃতির। প্রশস্ত কম, কিন্তু লম্বাটে। তখন হালখাতার জন্য এ ধরনের খাতাই ব্যবহার হতো। এখনো অনেক ব্যবসায়ী দৈনন্দিন কেনাবেচার হিসাব রাখতে এ ধরনের খাতা ব্যবহার করে থাকেন। তবে প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে। এখন আর হিসাব রাখতে খেরোখাতার দরকার হয় না। বড় বড় ব্যবসায়ীরা হিসাব রাখেন কম্পিউটারে।

মোগল সম্রাট আকবর আধুনিক বাংলা সন প্রবর্তন করেন। কৃষিকাজের সুবিধার জন্য সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ বাংলা সন চালু করেন। এ সন কার্যকর হয় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর তার সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে। হিজরি চন্দ্রসন ও বাংলা সৌরসন ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তন করা হয়। এই সন প্রথমে ফসলি সন বলে পরিচিত ছিল, পরে বঙ্গাব্দ নামে পরিচিতি পায়।

মোগল সম্রাট আকবরের আমল থেকেই পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালন শুরু হয়। তখন জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষক জমিদারদের খাজনা পরিশোধ করত। আর পহেলা বৈশাখে জমিদাররা কৃষকদের মিষ্টি খাওয়াত। তখন এ উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো, মেলা বসত। তখন থেকেই মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে যায় পহেলা বৈশাখ। কালক্রমে উৎসবমুখর পরিবেশে আনন্দময় শুভদিন হিসেবে পালিত হতে থাকে পহেলা বৈশাখ।

এভাবে গ্রাম-বাংলার লোকজ জীবনের সঙ্গে পহেলা বৈশাখ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গেছে। পহেলা বৈশাখে মানুষ আরেকটি নতুন বছরের শুভ সূচনা করে। এজন্য সবাই ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, সবকিছু ধোয়া-মোছা করে। মুড়ি-মুড়কি, পিঠা, পায়েস, মিষ্টান্ন তৈরি করে। ভালো ভালো খাবার খায়। একে অপরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায় ও উপহার দেয়। আর ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গল কামনা করে।

পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উপলক্ষে বসে বৈশাখী মেলা। মেলায় বিভিন্ন কৃষিপণ্য, কুটিরশিল্পে তৈরি পণ্য, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প পাওয়া যায়। শিশুদের জন্য থাকে নানা রকম খেলনা। চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা, হাওয়াই মিঠাই, হরেক রকম মিষ্টি ইত্যাদি পাওয়া যায়। গৃহস্থালী বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হয় বৈশাখী মেলায়।

বৈশাখী মেলা উপলক্ষে থাকে নানান বিনোদনের আয়োজন। পালাগান, জারিগান, সারিগান, কবিগান, গম্ভীরা, আলকাপ, বাউলগান, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালি গান পরিবেশন করে লোকজ শিল্পীরা। মেলার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকে যাত্রা, সার্কাস, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, বায়স্কোপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মফঃস্বলে এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈশাখে উপলক্ষে এক সময় ঢাকায় ঘুড়ি প্রতিযোগিতা হতো। মুন্সিগঞ্জে হতো গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা। এরকম সারা দেশজুড়ে হতো ষাড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, ঘোড়দৌড়, পায়রা ওড়ানো, নৌকাবাইচ ইত্যাদি খেলা। এসব এখন হারিয়ে গেছে। তবে চট্টগ্রামে এখনো অনুষ্ঠিত হয় বলীখেলা। দেশের কোথাও কোথাও হাডুডু খেলা হয়।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তারা চৈত্র সংক্রান্তির শেষে ও বৈশাখের প্রথম দিনে উৎসব পালন করে। পার্বত্য আদিবাসীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বৈসাবি। ত্রিপুরা আদিবাসীরা এ উৎসবকে বৈসুক বলে, মারমারা বলে সাংগ্রাই আর চাকমারা বলে বিজু। এ তিনটি নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে হয়েছে বৈসাবি। চৈত্র মাসের শেষ দুই দিন ও বৈশাখের প্রথম দিন মোট এই তিনটি দিন বৈসাবি পালিত হয়। বৈসাবি উৎসবে তারা পুরানো বছরকে বিদায় জানায়। আর নতুন বছরকে বরণ করে নেয়।

বৈসাবি উৎসবের প্রথম দিনটির নাম ফুলবিজু। এদিন শিশু-কিশোররা ফুল তুলে ঘর সাজায়। দ্বিতীয় দিন মুরুবিজু। এদিন নানারকম সবজি দিয়ে নিরামিষ রান্না করা হয়। নানারকম পিঠা ও মিষ্টান্ন তৈরি করা হয়। এদিন মূল অনুষ্ঠান হয়। এ উপলক্ষে সবাই সবার বাড়িতে বেড়াতে যায়। বাড়িতে সকলকে নানান পদ পরিবেশন করে আপ্যায়ন করা হয়।

আদিবাসীরা আদিকাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এ উৎসব পালন করছে। এ উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ঐতিহ্যবাহী খেলা ও নাচ গানের অনুষ্ঠান করা হয়। মারমারা পহেলা বৈশাখে পানি খেলার আয়োজন করে। পানি তাদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক। মারমা তরুণ-তরুণীরা পানি ছিটিয়ে নিজেদের পবিত্র করে নেয়। মারমাদের খুবই প্রিয় একটি উৎসব পানিখেলা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নববর্ষ পালনের রেওয়াজ আছে। পাশ্চাত্যে পহেলা জানুয়ারি নববর্ষ পালন করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টায় পর তারা আনন্দে মেতে উঠে। ১ জানুয়ারি গীর্জায় প্রার্থনা করে। নববর্ষে ইরানিরা পালন করে নওরোজ উৎসব। নওরোজ উপলক্ষে সাতদিন ধরে অনুষ্ঠান চলে। চীন, জাপান, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশেও নববর্ষ পালিত হয় আনন্দমুখর পরিবেশে। এক্ষেত্রে মুসলিম দেশে যারা হিজরি সন অনুসরণ করেন তাদের নববর্ষ শুরু হয় আশুরার বিষাদ নিয়ে। ইংরেজি কিংবা হিজরি নববর্ষে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির যোগসূত্র আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো বাঙালির পহেলা বৈশাখ। বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান এমনকি আদিবাসী সম্প্রদায়ও পহেলা বৈশাখে নববর্ষ পালন করে। প্রকৃত অর্থে নববর্ষে সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনেই শুরু হয় 'হালখাতা'।

বর্তমানে শহুরে সংস্কৃতির বিকাশের ভিড়ে পহেলা বৈশাখ হারিয়ে যায়নি। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরেও বৈশাখী মেলা আর নানা আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকার রমনার বটমূলে বৈশাখের প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের উদ্যোগে শুরু হয় আবহনী গান। এর মাধ্যমে বৈশাখকে বরণ করে নেওয়া হয়। চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলায় নববর্ষকে সম্ভাষণ জানানো হয়। চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে বের হয় বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা। এ শোভাযাত্রার জন্য চারুকলার ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পীরা তৈরি করেন বিশালাকার হাতি, ঘোড়া, বক, সাপসহ নানান প্রাণী। আর নানা রঙের মুখোশ।

ধানমণ্ডির রবীন্দ্র সরোবরে বসে গানের আসর। এদিনে সকল শ্রেণির মানুষ ভালো পোশাক পরিধান করে, ভালো খাবার খাওয়ার চেষ্টা করে। তবে ঢাকার রমনায় ইলিশ-পান্তা খাওয়া রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকে বাড়িতেও ইলিশ-পান্তার আয়োজন করে থাকে। এদিনে মেয়েরা পরে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি, গলায় মালা, কপালে টিপ, খোপায় ফুল গুঁজে দেয়। ছেলেরা পরে পায়জামা-পাঞ্জাবি। অনেকে ধুতি আর পাঞ্জাবিও পরে। রমনা, চারুকলা, শহীদ মিনার, টিএসসি, দোয়েল চত্বর, বাংলা একাডেমীসহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থাকে লোকে লোকারণ্য।

বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উভয় আন্দোলনে উদ্দীপনামূলক ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান বাঙালি সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র সংগীতের উপর আঘাত হানে। এর প্রতিবাদে তখন থেকেই পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন শুরু হয়। পহেলা বৈশাখে এ অনুষ্ঠান ক্রমেই জনপ্রিয় হতে থাকে। এক পর্যায়ে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ঘটা করে নববর্ষ পালিত হতে থাকে, যা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে।

সবশেষে, চৈত্রের শেষে কিংবা পহেলা বৈশাখে রবীন্দ্ররচনা থেকে একটি কথাই সকলের উদ্দেশ্যে বলা যায় -

শত্রু হও বন্ধু হও যেখানে যে কেহ রও
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বর্ষের সাথে পুরাতন অপরাধ যত...

আবু রেজা
সিনিয়র কার্যক্রম কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা অভিযান

সাকিলা মতিন মৃদুলা

সত্যের নারী পুরুষ

সৎ এবং সত্যের কি কোন নারী পুরুষ হয়? কিংবা মনুষত্বের? অন্যায় কিংবা অন্যায়কারীর কি কোনও লিঙ্গ ভেদাভেদ আছে? থাকা উচিৎ কি? নিশ্চয়ই নয়! খুব বেশী বোধহীন স্থবির মানুষগুলোকে সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। প্রয়োজনে মুখোমুখি করাতে হবে। কে করাবে? কে নেবে দায়িত্ব? এ যে গুরুভার! অস্থির সময় আর বাণিজ্যিক বাস্তবতা একের কাছ থেকে অন্যকে দূরে সরিয়ে দিলেও বিচ্ছিন্নতাবোধ আজও সম্পূর্ণত গ্রাস করতে পারেনি মানুষকে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা! ছিলো, আছে, হয়তো থাকবে কিংবা নয়। কিন্তু নারী কি তাই বলে দায়িত্ব কিংবা জবাবদিহিতা থেকে পিছিয়ে যাবে? জবাবদিহিতায় স্বচ্ছতা বাড়ে, বাড়ে স্পষ্টতা। সুযোগবঞ্চিত সংখ্যালঘু মানুষগুলোর জন্য জবাব দেবে সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষেরা। নারী তো মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ নয়। তবে সে কেন থাকবে জবাবদিহিতার বাইরে? সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে একজন নারীও যদি থেকে থাকে তবে তাকে জবাব দিতে হবে। জবাবদিহিতা প্রশ্নে সে মুখ খুলবে। কারণ দর্শাতে গিয়ে জানাবে তার সমস্যা। বেরিয়ে আসবে লুকানো ফাঁকফোঁকর। এই প্রক্রিয়ায় সমস্যা এবং সমাধান হবে অনেক বেশী গতিশীল।

শ্বাশুড়ি-বৌ সম্পর্কের নেতিবাচক দিকটি পুরুষতন্ত্রের প্রভাব। হতেই পারে! কিন্তু চরিত্রগুলো যদি হয় সুবিধাভোগী শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি? সেক্ষেত্রে প্রয়োজন জবাবদিহিতা। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন অন্যায়কারী যে কেউ এই জবাবদিহিতার অংশ হতে বাধ্য। তা না হলে গৃহকর্ত্রীর নির্যাতনে গৃহপরিচারিকার মৃত্যু বন্ধ হবে না। বন্ধ হবে না উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অলিখিত যৌতুক সংস্কৃতি। আপাত দৃষ্টিতে যা ভালোবাসার উপঢৌকন। সংসদ কিংবা সরকারী অথবা বেসরকারী যে কোন সংস্থা- প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরী। তা না হলে সংখ্যাগত বৃদ্ধিই শুধু ঘটবে। গুণগত কিংবা সার্বিক মান উন্নয়নে থাকবে না তাদের কোনই অবদান। এই কাজটির জন্য প্রয়োজন হবে আত্মসমালোচনা।

২০০২ সালে সিমি লজ্জা দিয়েছিল। সমাজের বিবেককে দায়বদ্ধ করে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। সিমি লিখে গিয়েছিল, সমাজের কিছু সুবিধাবাদী মুখোশধারী মানুষের মুখোশ খুলতে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে তার এই আত্মহনন।

প্রতিবাদের সবগুলো ভাষা যখন শব্দহীন এবং অকার্যকর, তখন এটাই ছিল সিমির কাছে এক এবং একমাত্র পথ। কি নিদারুণ অসহায়ত্ব। সিমি কোন দলে ছিল না। সিমি বিশেষ ছিল সাধারণ একটি মেয়ে, সাধারণ একজন মানুষ। নিভৃতচারী বিপ্লবী। কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথার বিরূদ্ধে একনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু কোন দল কিংবা মতের নয়। কেবল বিবেক আর বোধের স্পষ্টতা আর সত্য সুন্দরের কাছেই ছিল তার দায়বদ্ধতা।

বিপ্লবী, প্রতিবাদী, সমাজ সচেতন এবং একই সাথে পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল সিমি স্বপ্ন দেখতো সুন্দর একটি ভবিষ্যতের। স্বপ্নকে সিমি সাজাতো তুলির আঁচড়ে। পড়াশোনার ফাকে টিউশনি করতো সংগ্রামী মেয়েটি। নিজের সৃজনশীলতায় গড়ে তুলতো সুনিপুণ শিল্পকর্ম। অল্প বয়সেই বিবেক তাকে শিখিয়েছিল মধ্যবিত্ত পিতার উপর খরচের বোঝা না বাড়াতে। সৎভাবে বাঁচতে চেয়েছিল সিমি নামের সৎ সাহসী মেয়েটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিমি পারেনি টিকে থাকতে। দায়ভার কি কেবল পুরুষ কিংবা পুরুষশাসিত সমাজের? শিক্ষিত পদস্থ নারী সমাজের কি কোনই দায়ভার নেই? অসংখ্য সিমি আজও হারিয়ে যায়, যাচ্ছে। কিন্তু আর কত কাল?

সবার জন্য, সবার মাঝে 'নারী' কেমন আছে? কিভাবে আছে? কিভাবে থাকা উচিৎ? কিভাবে রাখা যায় তাদের? সব কিছু নিয়ে সবার মনে এলোমেলো ভাবনা আর অগোছালো দায়িত্ববোধকে এক কাতারে গুছিয়ে আনার জন্যই 'নারী দিবস'। এর মানে এই নয় যে দিবসটি কেবল নারীর। নারী তো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিউ নয়! অবশ্যই সমাজ তো নারী পুরুষ সকলকে নিয়ে।

সুফিয়া কামালের মতে, "সেমিনারে মঞ্চে উপবিষ্ট থাকে গুটি কয়েক সুযোগ প্রাপ্ত বক্তা। শ্রোতা হিসেবে অসংখ্য নারী পুরুষ কোন কথা বলার সুযোগ পায় না। করা দরকার এমন সভা

সমাবেশ যেখানে সবাই কথা বলতে পারে। সকলের কথা শুনে তবে একটা মত ঠিক করা যায়।" (মালেকা বেগম: *অন্তরঙ্গ সুফিয়া কামাল*)

নারী দিবস তাই কথা বলার জন্য। নারীর কথা সবাইকে জানানোর জন্য। এখান থেকেই কথা, ব্যথা, সত্য, মিথ্যা, প্রশ্ন উত্তর হাঁটিহাঁটি পায়ে এগিয়ে যায়। আদায় করে নেয় নিজস্ব স্থান, নিজস্বতায়। এখান থেকেই শুরু সচেতনতার, স্পষ্টবাদিতার, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের। গভীরে না পৌঁছেই, বিশ্লেষণে ডুবে না গিয়েই অবান্তর প্রশ্ন, 'নারী দিবস কেন? দৈনিক পত্রিকা বা কোন সাময়িকীতে নারীদের জন্য আলাদা একটা পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকবে কেন? পাতা কেন? পুরুষের জন্য তো এমন আলাদা কিছু নেই। একজন মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকার দাবি করার অর্থ পুরুষের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন কোন অবস্থান নয়।

মানুষ হিসেবে সচেতনতাবোধ, অধিকার বিষয়ে সাহসিকতা পূর্ণাঙ্গতা পায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, প্রতিবাদে। এই প্রক্রিয়ায় পুরুষরা প্রতিযোগী নয়, হয়ে উঠতে পারে সহযাত্রী। নারীর পাশে নারীর বন্ধু, 'একজন মানুষ'। সুফিয়া কামালের ভাষায়, "পথসভা করতে হবে। পথের পুরুষ মানুষদের জাগাতে হবে, সচেতন করতে হবে, আমাদের নারী অধিকার বিষয়ে। আমরা পুরুষের বিরুদ্ধে নই"। (মালেকা বেগম: *অন্তরঙ্গ সুফিয়া কামাল*)

মাত্র ১২ বছর বয়সে বিবাহ হয়ে যাবার পরও থেমে থাকেনি বেগম সুফিয়া কামালের সাহসী পথ চলা। আপন ভুবনে নির্ভীক থেকে প্রাণের তাগিদেই লিখতেন। *তরুণ* পত্রিকায় বর্ষা বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় তার লেখা। যোগসূত্র ছিল স্বামী নামের ভালোবাসার মানুষটি। প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, ছিল ভালোবাসা-মিশ্রিত সহযোগিতা। সুফিয়া কামালের প্রতিভাকে হারতে দেননি। পাশে থেকেছেন একজন স্বামী, একজন পুরুষ। পরিবারের অন্যান্য কর্তা পুরুষের বাধার বিপরীতেও তার নীরব প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে সুফিয়া কামালের প্রতিভার চারাগাছ।

সুফিয়া কামাল বলেছিলেন, "স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, নিজেকে মানবিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। পুরুষশাসিত সমাজ শতাব্দীকাল ধরে মেয়েদের পায়ে যে বেড়ি পড়িয়ে রেখেছে তা ভাঙতে গেলে সচেতন লড়াই দরকার।" এই সচেতন লড়াইয়ে পুরুষদের অবদানকেও মূল্যায়ন করতে হবে, আহ্বান জানাতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র কলম ধরেছিলেন নারী পুরুষ বৈষম্যের বিরুদ্ধে। 'সাম্য' প্রবন্ধে লিখেছিলেন–"আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বন্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু ভালো আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু কেন?" মহাকবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, 'যাহারা নারীকে পেছনে রাখিয়া, অন্ধ অন্তঃপুরের বেষ্টনে বেষ্টিত রাখিয়া, জাতীয় জাগরণের কল্যাণ কামনা করে আমার বলিতে কুণ্ঠা নাই তাহারা মহামূর্খ।' নারী মুক্তির অগ্রদূতমহিয়সী নারী তার বেগম রোকেয়া হয়ে ওঠার পেছনে বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের, বোন করিমুন্নেসা এবং স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের অবদান স্মরণ করেছেন কৃতজ্ঞ চিত্তে।

তাহলে কি দাঁড়ালো? -'সত্য এবং সুন্দর প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠ কোন নারী পুরুষ নেই।' মনুষ্যত্বের কাছে নারী পুরুষ সবাই সমান। অমানবিকতা আর বিবেকহীনতার কাছে বোধশক্তি অসম। জীবন আজ বড্ড বেশী কঠিন। আর তাই সহজের পেছনে সবার ছুটে চলা। সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ, সহজ শর্তে রুট পারমিট, সহজে শিল্পী, সহজে লেখক, সহজেই ডিগ্রী। এত কিছু সহজের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে সত্যের অস্তিত্ব। জীবনীশক্তিও হয়ে পড়েছে ম্রিয়মাণ, সহজ, নাজুক। বোধহীন, বিবেকহীন হয়ে পড়ছে মানুষ। অস্থিরতা আর হতাশার করালগ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে প্রজন্ম, ফুরিয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন।

বেঁচে থাকাটাই যেন আজ পরিহাস! আর তাই খুব সহজেই মৃত্যুকে নিয়ে খেলছে মানুষ। সাধ আর সাধ্যের বিস্তর ফারাক তাদেরকে করে তুলেছে অপ্রতিরোধ্য। কত সহজেই মানুষ মানুষকে খুন করে, ধর্ষণ করে, এসিড ছোঁড়ে। খোলা আকাশের নিচে, নিজ গৃহকোণে, বাবার স্নেহের কোলটিতে, মায়ের মমতার মায়াজালে কোথাও মানুষ ভালো নেই। ঘর থেকে বের হয়ে ফিরে আসবার গ্যারান্টি নেই। নিজ গৃহেও নেই এতটুকু নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা। এভাবেই কি চলবে? তবে কি সত্য, সুন্দরের স্বপ্ন তলিয়ে যাবে স্রোতের মুখে? সবকিছুই চলে যাবে নষ্টদের দখলে? কিছুই কি করার নেই? কিছুই কি বলার নেই?

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে.... .. নতুন করে জেগে ওঠা, স্বপ্ন দেখা। দাঁড়াতে হবে সত্যের মুখোমুখি। শিক্ষিত, সুবিধাভোগী নারীসমাজকে জবাবদিহিতার এই দায়ভার নিতে হবে। দ্বিধাহীন কণ্ঠে, বাধাহীন প্রত্যয়ে। সত্য এবং সুন্দরের প্রশ্নে অনমনীয় দৃপ্ত পদক্ষেপে তারাই এগিয়ে আসবে। 'আমরা যদি না জাগি মা? কেমনে সকাল হবে?'

সাকিলা মতিন মৃদুলা
উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক
গণসাক্ষরতা অভিযান

কর্মমুখী শিক্ষাই অর্থনৈতিক মুক্তির পথ: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বিএ বা এমএ পাস করে দীর্ঘদিন ধরে বেকার জীবন কাটানোর চেয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহজে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনেক ভালো। বিপুল জনসংখ্যার এ দেশে কর্মমুখী শিক্ষাই অর্থনৈতিক মুক্তির পথ হতে পারে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

গতকাল বুধবার এলজিইডি মিলনায়তনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আয়োজনে 'জাতীয় দক্ষতা সনদ' বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম মিয়ার সভাপতিত্বে আইএলও কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. শ্রীনিবাস বি রেড্ডি, এনএসডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জীবন কুমার চৌধুরী, আইএলও ঢাকার চীফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার সিজার দারগুটান ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রথম কাউন্সিলর ফিলিপ জ্যাক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিপুল অদক্ষ জনসংখ্যা সমাজের বোঝা হলেও দক্ষ জনসংখ্যা দেশের সম্পদ। আমাদের জনসংখ্যাকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিয়ে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। আমাদের দেশের ৮০ লক্ষাধিক জনশক্তি বিদেশে কাজ করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই আধা-দক্ষ বা অদক্ষ। তারা দক্ষ হলে তাদের অর্জিত অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ হতে পারত। বিদেশের মাটিতে তাদের কষ্টের মাত্রাও কম হতো।'

মন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে দেশের মাত্র ১ শতাংশ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করত। গত পাঁচ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬ শতাংশের অধিক হয়েছে। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে ৩০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

বর্ণিক বার্তা ৩.০৪.২০১৪

সব মানুষের জন্য তথ্য সাক্ষরতা অপরিহার্য

ঢাকার সাভারে গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে তথ্য সাক্ষরতা ও জাতিসংঘ সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কর্মশালায় বক্তারা বলেন, সব শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য তথ্য সাক্ষরতা অপরিহার্য। জীবন চলার সর্বক্ষেত্রে রয়েছে এর ব্যবহার।

জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র (ইউনিক), ঢাকা ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজ, বাংলাদেশ (সিস, বি) দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করেছে। সাভারের ভাকুর্ত্তা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আতাউর রহমান। এতে শ্যামলাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বি কে টি উচ্চবিদ্যালয়, মুশরিখোলা উচ্চ বিদ্যালয় এবং আয়োজক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। গতকাল তাদের জাতিসংঘ সাক্ষরতা ও তথ্য সাক্ষরতাসহ মুদ্রণ, অমুদ্রণ ও প্রযুক্তিগত তথ্যের উৎস এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। আজ শনিবার তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

জাতিসংঘ সাক্ষরতা বিষয়ে বক্তব্য দেন ইউনিক, ঢাকার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সিসি,বির চেয়ারম্যান কাজী আলী রেজা, তথ্য সাক্ষরতা সম্পর্কে ধারণা দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সিস,বির নির্বাহী পরিচালক মু. মেজবাহ-উল-ইসলাম ও গবেষণা পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন আহাম্মাদ এবং মিডিয়া সাক্ষরতা বিষয়ে মিডিয়া পরিচালক চিন্ময় মুৎসুদ্দী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধারণা উপস্থাপন করেন এ কে এম নুরুল আলম।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অতিথিরা তথ্য, তথ্যের উৎস এবং জাতিসংঘ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। ছাত্রছাত্রীদের নানা জিজ্ঞাসার সমাধান তুলে ধরেন তাঁরা।

আরও উপস্থিত ছিলেন সাভার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস, ভাকুর্ত্তা ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোল্লা নজরুল ইসলাম, সাভার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাহেলা খানম ও সমাজসেবক সালাউদ্দিন খান, আহমেদ হাসান প্রমুখ।

প্রকৃত ও সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য সিস,বি ও ইউনিক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করছে।

প্রথম আলো ০৫.০৪.২০১৪

স্কুল-ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে আছে, কাজে নেই

৯০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাদান ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) গঠন করে ক্ষমতা দেয়া হলেও অধিকাংশ কমিটি নিষ্ক্রিয়। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে তা কোন কাজেই আসছে না। কমিটি মূলত 'নামে আছে, কাজে নেই।'

দেশের ৯০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরই বলছে, কমিটি ঠিকমতো কাজ করছে না। আর স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানিয়েছেন, প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে কমিটির সভা হওয়ার নিয়ম থাকলেও মাসের পর মাস কোন সভা হয় না। তবে প্রধান শিক্ষক সদস্যদের বাড়ি গিয়ে 'সভায় অংশগ্রহণ করছেন বলে সদস্যদের স্বাক্ষর নিয়ে আসেন। আবার কখনো সভা হলেও কোরাম পূর্ণ হয় না। কোরাম পূর্ণ দেখানোর জন্য অনুপস্থিত সদস্যদের বাড়ি গিয়ে স্বাক্ষর নিয়ে আসা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২ সালের ১৫ নভেম্বর এসএমসি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এই নির্দেশনা অনুসারে কমিটিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সদস্য সচিব হবেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য মনোনীত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বিদ্যোৎসাহী সদস্য, একজন জমিদাতা সদস্য, নিকটস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারি শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রতিনিধি, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত দুজন পুরুষ ও দুজন মহিলা অভিভাবক সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের একজন সদস্য এই কমিটির সদস্য হবেন। সকলের ভোটে নির্বাচিত হবেন সভাপতি।

বিদ্যালয়ের সকল কার্যাবলী মনিটরিং, শিক্ষক ছাত্রের উপস্থিতি, শিক্ষকদের কর্তব্যপরায়ণতা, পাঠদান তদারকি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ, উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, শতভাগ শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণসহ ৫০-এর অধিক কাজ করা কমিটির দায়িত্ব। কিন্তু এসব কোন কাজেই অংশ নিতে আগ্রহী নন কমিটির সদস্যরা। কেন অংশ নিতে আগ্রহী নন, এমন প্রশ্নের জবাবে এক সদস্য বলেন, 'কমিটির সদস্যরা সচেতন নন। আর্থিক কোন সম্মানীও নেই। এ প্রতিষ্ঠানে সময় ব্যয়কে তারা অপচয় মনে করেন। এছাড়া এ কমিটি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তাও মনিটরিং করছে না কেউ।'

১১ সদস্যের এই কমিটি শিক্ষার মানোন্নয়নে কোন কাজ না করলেও কমিটি গঠনে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব। কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপনের আলোকেই দুজনকে মনোনয়নের সুযোগ রয়েছে স্থানীয় সংসদ সদস্যের। এছাড়া শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের মধ্য থেকে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন করার কথা থাকলেও বেশিরভাগ স্কুলে স্থানীয় সংসদ সদস্য বা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রভাব খাটিয়ে তার পছন্দের চারজন অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচিত করেন। অন্যান্য পদেও তার পছন্দের ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়। এ কারণে প্রধান শিক্ষকের কোন ভূমিকাই থাকে না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কমিটি গঠনে সরকারের উদ্যোগ ভালো। কিন্তু এই কমিটিকে কিভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা নেই। এ কারণে এখানো ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করার আগেই ঝরে পড়ে।

ইত্তেফাক ৬.০৪.২০১৪

সেশন চার্জ আদায়ে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পুনর্ভর্তি ফি বা সেশন চার্জ আদায় থেকে সংশ্লিষ্টদের বিরত রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের বেঞ্চ এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার রুলসহ অন্তর্বর্তীকালীন এ আদেশ দেন।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে 'ফ্রিস্টাইলে চলছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল' শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপা হয়। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ বিষয়ে নীতিমালা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবক জাবেদ ফারুক। এতে রাজধানীর ২৪টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলকেও বিবাদী করা হয়।

রুলে এসব স্কুলে (প্লে-গ্রুপ থেকে এ-লেভেল পর্যন্ত) মাসিক বেতন, পুনর্ভর্তি ফি বা সেশন চার্জ আদায়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি এবং তদারক সেল গঠনের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। শিক্ষা সচিব, আইন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরেরর মহাপরিচালকসহ বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবার দিতে বলা হয়েছে।

প্রথম আলো ২৪.০৪.২০১৪

যশোরে ৫০৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

যশোর জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক সংকট চলছে। জেলার ১ হাজার ২৭৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৮টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ৬৯৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এসব পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এতে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার আট উপজেলায় সদ্য জাতীয়করণ করা ৬০০ স্কুলসহ মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১ হাজার ২৭৪টি। এসব বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে একজন করে প্রধান শিক্ষকের পদ রয়েছে। বর্তমানে ৭৬৬টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক রয়েছে। বাকি ৫০৮টি বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই। প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনিরামপুর উপজেলায়।

সূত্র আরো জানায়, মনিরামপুর উপজেলার ২৬২ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৫টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। এছাড়া কেশবপুর উপজেলায় ৪১টি, সদরে ৩৩, বাঘারপাড়ায় ২৭, চৌগাছায় ২৫, ঝিকরগাছায় ২৩, অভয়নগরে ২২ ও শার্শায় সাতটি পদ শূন্য রয়েছে। অন্যদিকে জেলায় প্রাথমিকে ৬৯৩ জন সহকারী শিক্ষকের পদও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১৫৫টি, মনিরামপুরে ১২৭, কেশবপুরে ৮৬, চৌগাছায় ৮৬, শার্শায় ৭৮, অভয়নগরে ৬৫, ঝিকরগাছায় ৫৮ ও বাঘারপাড়ায় ৩৮টি পদ খালি রয়েছে। নূতন শিক্ষাবর্ষে এসব পদ শূন্য রেখেই শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এতে প্রাথমিকের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

বর্ণিক বার্তা ২৬.০৪.২০১৪

যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন ৩৫ শতাংশ হচ্ছে

পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন ১০ শতাংশ বাড়িয়ে এবার ৩৫ শতাংশে উন্নীত করা হচ্ছে। সব পরীক্ষার সময় আগের মতো আড়াই ঘন্টা থাকছে। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য চলতি বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রর কাঠামো ও নম্বর বিভাজন চূড়ান্তকালে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া প্রাথমিক সমাপনীতে ২০১২ সালে প্রথমবারের মতো ১০ শতাংশ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছিল। গত বছর এ প্রশ্ন ছিল ২৫ শতাংশ। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নে চিন্তা করে শিক্ষার্থীদের উত্তর লিখতে হয়। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীই দুই ঘন্টায় পরীক্ষা শেষ করতে না পারায় গত বছর সময় ৩০ মিনিট বাড়িয়ে আড়াই ঘন্টা করা হয়।

এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি'র (নেপ) মহাপরিচালক মো. নাজমুল হাসান খান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে এবারের সমাপনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে যোগ্যতাভিত্তিক ৩৫ শতাংশ এবং ট্র্যাডিশনাল ৬৫ শতাংশ প্রশ্ন থাকবে।' তিনি বলেন, প্রাথমিক সমাপনীতে পর্যায়ক্রমে শতভাগ প্রশ্নই যোগ্যতাভিত্তিক করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। প্রতি বছরই যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের হার বাড়ানো হবে।

এবছর প্রশ্নের হার গত বছরের থেকে ১০ শতাংশ বাড়লেও পরীক্ষার সময় বাড়ানো হয়নি বলে জানান নাজমুল হাসান। তিনি বলেন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা ছাড়াও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করেই যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের হার এবার ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।

সমকাল ২৭.০৪.২০১৪

জেএসসি-বৃত্তির নীতিমালা সংশোধন

জেএসসির বৃত্তির নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ছাড়া মোট প্রাপ্ত নম্বরের ওপর ভিত্তি করে জেএসসি বৃত্তির নীতিমালা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব অসীম কুমার কর্মকার *আমাদের সময়*-কে বলেন, আগের নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। এর ধারা-৩-এর 'ক'তে উল্লেখ করা হয়েছে-সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে। তবে জেএসসির ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয় ছাড়া প্রাপ্ত জিপিএ নম্বরের ওপর ভিত্তি করে বৃত্তি দিতে হবে।

তিনি বলেন, আগে জেএসসি/ জেডিসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ'র ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হতো। কিন্তু গত ২২ এপ্রিল সংশোধন করা হয়েছে নীতিমালা।

সর্বশেষ ২০১৩ সালের জেএসসিতে ৩০ হাজার ৮০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৯ হাজার ৮০০ শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি ও ২১ হাজার শিক্ষার্থী সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) গত ১০ এপ্রিল বৃত্তি ঘোষণা করে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সাল থেকে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলের ওপর বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার অতিরিক্ত পৃথকভাবে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। তবে মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির জন্য পৃথক কোনও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা চালুর পর মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরও জিপিএ ফলের ওপর ভিত্তি করে সাধারণ ও মেধা বৃত্তি দেওয়া হয়।

আমাদের সময় ২৭.০৪.২০১৪

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা: সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ শীর্ষক মতবিনিময় সভা

শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ, সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা বিনিময় এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসনের

প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মতামত, সুপারিশ বা পরামর্শ গ্রহণ করার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংস্থা রূপান্তর, খুলনার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা: সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভা। ১৯ মার্চ ২০১৪ তারিখ খুলনায় আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা প্রশাসক আনিস মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চল ও সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, খুলনা। সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ব্র্যাক ইউ-আইইডি সিনিয়র অ্যাডভাইজর ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ভাইস চেয়ার ড. মনজুর আহমেদ। তিনি মূল উপস্থাপনায় সুশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ, জনঅংশগ্রহণ, শিক্ষা ও শিক্ষার মান, শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিতকরণে সরকারি উদ্যোগসমূহ, শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে জনঅংশগ্রহণ ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করেন।

সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, মিডিয়া প্রতিনিধি ও বেসরকারী সংগঠন প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীগণ তাদের এলাকার শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন চিত্র ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের মত আঞ্চলিক বৈচিত্র্যময় দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নসহ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সর্বস্তরে বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেন। অংশগ্রহণকারীরা সীমিত সম্পদের মধ্যে শিক্ষায় বরাদ্দের সর্বোচ্চ সদব্যবহার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্যও বিকেন্দ্রীকরণ এবং সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ বলে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষে রাজশ্রী গায়েন, মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন রূপান্তর-এর নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার গুহ।

রাজশ্রী গায়েন

'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা

'তথ্য অধিকার আইন'-এর যথাযথ ব্যবহার করে শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণের কাছে সহজলভ্য করা যায় এবং শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করা যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা এবং তাদের মতামত, সুপারিশ বা পরামর্শ গ্রহণ করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ -এর যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার সকলের জন্য এ সুযোগ করে দিতে পারে। গত ২২ মার্চ ২০১৪ তারিখ সুনামগঞ্জ জেলায় সহযোগী সংগঠন আইডিয়া-র সাথে যৌথ উদ্যোগে এবং ২৬ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ নেত্রকোণা জেলায় সাহযোগী সংস্থা স্বাবলম্বী উন্নয়ন সংস্থা (সাস)-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভা দুটিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও শিক্ষা সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ। দুইটি সভাতেই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের/দপ্তরের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, সুধী সমাজের প্রতিনিধি, মিডিয়া প্রতিনিধি ও বেসরকারি সংগঠন প্রতিনিধিসহ প্রায় ৭০-৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর উপ-সচিব মো. রফিকুল হাসান।

সভার প্রেক্ষাপট ও মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক রাজশ্রী গায়েন। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীগণ 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯', মানসম্মত শিক্ষার সাথে এর সম্পর্ক এবং শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করতে কিভাবে এ আইন সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

রাজশ্রী গায়েন

প্রয়াস-এর চাহিদা নিরূপণ ও পর্যালোচনা শীর্ষক সভা

২৭ মার্চ ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস'-এর চাহিদা নিরূপণ ও পর্যালোচনা শীর্ষক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, লেখক, প্রকাশক, ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট, প্রিন্ট মিডিয়া ও অনলাইন পোর্টালের প্রতিনিধিসহ গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে 'প্রয়াস' পত্রিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণীত হয়। এ পত্রিকার বিষয়, আঙ্গিক ও নকশা বিষয়ে এসব সুপারিশ প্রণীত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপপরিচালক তপন কুমার দাশ এ সভাটি পরিচালনা করেন।

অংশগ্রহণকারীগণ কমিউনিটি এডুকেশন নিউজলেটার 'প্রয়াস'-এর উন্নয়নে মতামত প্রদানের পাশাপাশি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা সহযোগী সংস্থাকে আরো বেশি কপি পত্রিকা প্রদানের অনুরোধ করেন। 'প্রয়াস' ফোরাম গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সভা শেষ হয়।

আবু রেজা

শিক্ষার বাজেট, বাজেটের শিক্ষা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও এর যথাযথ ব্যবহারের দাবি জানিয়ে গত ৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ঢাকাস্থ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো 'শিক্ষার বাজেট, বাজেটের শিক্ষা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভাইস চেয়ার ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি-আইইডির সিনিয়র উপদেষ্টা ড. মনজুর আহমেদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা স্কুল অব ইকোনোমিকস্ এবং পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ। সভায় অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপদেষ্টা এম. হাফিজ উদ্দীন এবং এবিএম মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, বিআইডিএস এর প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. আসাদউজ্জামান এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ।

সভার প্রথমে উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য একশন এইড-এর ম্যানেজার এডুকেশন লুৎফুল খালেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী।

মূলত আসন্ন বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি বিষয়ে জনমানুষের দাবী/আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে গত মার্চ মাসে দেশের ৭টি বিভাগের ৯টি স্থানে 'সবার জন্য শিক্ষা ও জাতীয় বাজেট: চলমান ধারা ও আমাদের প্রত্যাশা' শীর্ষক ৯টি মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে তৃণমূলের মতামত গ্রহণ করা হয়। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত এসকল মতামতসমূহ অংশীজনের সাথে সহভাগিতা, শিক্ষা বাজেট বিষয়ে অভিজ্ঞজনদের মতামত গ্রহণ এবং সর্বোপরি নীতি পর্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে এ সভা আয়োজন করা হয়, যেখানে ৯টি জেলা থেকে আগত শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য এবং জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাবদ, গবেষক, শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধি, মিডিয়া প্রতিনিধি ও বেসরকারি সংগঠন প্রতিনিধিসহ প্রায় ১২০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি ছিল।

অংশগ্রহণকারীগণ আসন্ন বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানো এবং তার প্রায় ৫০% বেসিক এডুকেশনে ব্যয় করার ওপর জোর দেন। পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে যেন জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২০% অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেওয়া হয় তার বছর ভিত্তিক রোডম্যাপ করে পরিকল্পনা করার দাবি জানান।

রাজশ্রী গায়েন

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯ এপ্রিল ২০১৪ বৃহস্পতিবার ঢাকার আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ভবনে (লেভেল-২) গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর চেয়ারপার্সন ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন-এর সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী, ভাইস চেয়ারপার্সন ড. মনজুর আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জ্যোতি এফ. গমেজসহ শতাধিক সদস্য সংগঠনের নির্বাহী প্রধান/প্রতিনিধি উক্ত সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী-র স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল:

১. বিগত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;
২. অভিযান-এর ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন;
৩. অভিযান-এর ২০১৩ সালের অডিট রিপোর্ট বিবেচনা ও অনুমোদন;
৪. অভিযান-এর ২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ;
৫. নতুন এফিলিয়েট সদস্য নির্বাচন ও অনুমোদন;

আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সাধারণ সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অভিযান-এর নির্বাহী পর্ষদে কো-অপ্টেড কাউন্সিল সদস্য হিসেবে আশ্রয় ফাউন্ডেশন- খুলনা ও ব্যক্তি মর্যাদায় সদস্য জনাব জওশন আরা রহমান-এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় উপর্যুক্ত দু'টি সদস্য পদে আলো- নাটোর ও ব্যক্তি মর্যাদায় জনাব পারভীন মাহমুদ (প্রাক্তন সভাপতি, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস অব বাংলাদেশ)-কে নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও ৬টি সংগঠনকে অভিযান-এর এফিলিয়েট সদস্যপদ প্রদান করা হয়।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

মতবিনিময় সভা
EFA and the Post- 2015 Development Agenda: A Civil Society Perspective, Bangladesh

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইএফএ ২০১৫ পরবর্তী প্রক্রিয়া নিয়ে বেশকিছুদিন ধরে বহুবিধ কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। বাংলাদেশেও ইতোমধ্যে ইএফএ-২০১৫ পরবর্তী ভাবনা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ইতোমধ্যে EFA Post-২০১৫ প্রতিবেদনটি সম্পাদন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকেও গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে এডুকেশন ওয়াচ কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ইউনেস্কো'র গাইডলাইন অনুসারে ৩টি সেকশনে প্রতিবেদনটির খসড়া সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে উপর্যুক্ত প্রতিবেদনটি নিয়ে ৭টি বিভাগের জেলা পর্যায়ে ৭টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও এডুকেশন ওয়াচ আয়োজনে EFA and the Post- 2015 Development Agenda: A Civil Society Perspective, Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া নিয়ে ১৯ এপ্রিল ঢাকার আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ভবনে জাতীয় পর্যায়ে অংশীজনদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। সভাপতিত্ব করেন

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর চেয়ারপার্সন ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দীন। রিপোর্ট টিমের পক্ষ থেকে সিভিল সোসাইটি প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ব্র্যাক-এর এডুকেশনাল রিসার্চ ইউনিট-এর কর্মসূচি প্রধান ও এডুকেশন ওয়াচ-এর সদস্য সমীর রঞ্জন নাথ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ও এডুকেশন ওয়াচ-এর সদস্য অধ্যাপক নাজমুল হক।

জাতীয় প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের ভাইস চেয়ার ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি-আইইডির সিনিয়র উপদেষ্টা ড. মনজুর আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক। মতবিনিময় সভাটি সঞ্চালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক ও এডুকেশন ওয়াচ-এর সদস্য সচিব রাশেদা কে. চৌধুরী।

মতবিনিময় সভায় অভিযান-এর স্থানীয় পর্যায়ের সদস্য সংগঠনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও, দাতা সংস্থা ও গবেষণা সংগঠনসহ সিভিল সোসাইটির দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

মির্জা কামরুন নাহার

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সোসিও ইকোনমিক এ্যান্ড রুলাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন-এর যৌথ আয়োজনে নেত্রকোনা জেলার হোগলা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তন-এ ২৯-৩০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য/সদস্যা, স্থানীয় সরকার পরিষদ-এর প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন প্রতিনিধি ও সাংবাদিকসহ মোট ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টেশনের মূল বিষয়গুলো হলো- বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি পর্যালোচনা ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, আনন্দময় ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারণা, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল, কার্যকর শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, শিশুর শিখন সামর্থ শিক্ষকের করণীয়, কেমন বিদ্যালয় চাই, বিদ্যালয়ের মানউন্নয়ন ও কর্ম অঙ্গীকার ইত্যাদি।

ওরিয়েন্টেশনে সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল হামিদ, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক জামিল মুস্তাক।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল হামিদ।

মো. জামিল মুস্তাক

এ্যাসপবে-র ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

এ্যাসপবে-র ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী গত ১৯ এপ্রিল ২০১৪ একটি বিশাল কেক কেটে বাংলাদেশে উদযাপন করা হয়। এ্যাসপবে-এর ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রতিপাদ্য হলো 'এ্যাসপবে-এর ৫০ বছর: টিকে থাকার অভিপ্রায়- আলোকিত মানুষ গঠনে জীবনব্যাপী শিক্ষা'।

শিক্ষা বিষয়ে কর্মরত এনজিও, গবেষক ও শিক্ষক সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক জোট গণসাক্ষরতা আভিযান এ আয়োজনের উদ্যোগ নেয়। গণসাক্ষরতা আভিযানের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সুশীল সমাজের ভাবনা শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভার সাথে এ দিবসটি উদযাপন করা হয়। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এম পি যোগদান করেন। সভায় এ্যাসপবে এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সদস্যসহ প্রায় ২০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কে এম এনামুল হক

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

গত ২২ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় ফুলকোচা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় "প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন" বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন।

ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জামালপুর-এর আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা পরিচালক মো. আব্দুল হাই। ওরিয়েন্টেশন পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মেলান্দহ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জুয়েল আশ্রাফ, সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মিজানুর রহমান আখন্দ। বিষয়ভিত্তিক আলোচনার সঙ্গে অংশগ্রহণকারীগণ দগলীয়ভাবে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন। চিহ্নিত সমস্যাগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজের উপর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

সমাপনী দিনে অংশগ্রহণকারীদের ফুলকোচা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এসএম জিন্নাতুল বারী বলেন, ওরিয়েন্টেশনে স্থানীয় বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, সবাই চেষ্টা করলে ও আন্তরিক হলে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

মিজানুর রহমান আখন্দ

গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্য বার্তা

গ্রীষ্মের শুরুতে সাধারণত আমাদের দেশে ডায়রিয়া দেখা দেয়। নিরাপদ খাদ্য তৈরি, সংরক্ষণ, পরিবেশন এবং গ্রহণ ডায়রিয়া প্রতিরোধের অন্যতম উপায়।

ডায়রিয়া হলে–

- প্যাকেট স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার যেমন– ডাবের পানি, চিড়ার পানি ও ডালের পানি, ভাতের মাড়, চালের গুড়ার জাউ ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে খেতে দিন।
- রোগীকে স্বাভাবিক খাবার খাওয়ান।
- ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুকে মায়ের দুধসহ অন্যান্য খাবার বারে বারে খেতে দিন।
- ডায়রিয়া বেশি হলে রোগীকে অবশ্যই নিকটস্থ হাসপাতালে নিন।

প্রচণ্ড গরমে হিটস্ট্রোক হতে পারে

হিটস্ট্রোকের লক্ষণগুলো হচ্ছে–

বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, প্রস্রাব কমে যাওয়া, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া করা, ঘামতে-ঘামতে এক পর্যায়ে ঘাম থেমে যাওয়া, অস্বাভাবিক আচরণ, অজ্ঞান হয়ে পড়া ইত্যাদি।

হিটস্ট্রোক হলে

- রোগীকে দ্রুত ঠাণ্ডা স্থানে নিয়ে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করুন অথবা ফ্যানের নিচে রাখুন।
- ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে বা কাপড়ে বরফ পেঁচিয়ে শরীর মুছে দিন এবং ঠাণ্ডা পানি খেতে দিন।
- রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেললে দ্রুত হাসপাতালে নিন।

গ্রীষ্ম মৌসুমে অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে যেমন– ডায়রিয়া, ভাইরাসজনিত জ্বর, সর্দি-কাশি, জণ্ডিস, জলবসন্ত ইত্যাদি। এছাড়া ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যাও বেড়ে যেতে পারে। সচেতন হোন- সুস্থ থাকুন।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৩৯ বৈশাখ ১৪২১ এপ্রিল ২০১৪

বাংলা নববর্ষ সংখ্যা

স ম্পা দ ক

নতুনের আগমনে জীর্ণ পুরাতন ভেসে যাক, এমন কামনা জানিয়ে, নববর্ষকে আবাহন করার দীক্ষা দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমন কামনার মধ্যে কিছুটা রোমান্টিকতা আছে, আছে কিছুটা রীতিমাফিক চেনা শব্দ উচ্চারণের পুনরাবৃত্তি, কিন্তু নতুন বছরে এই প্রত্যাশার মধ্যে শুধুই আন্তরিক আকুতি নেই, আছে অন্যতর তাগিদ। পুরাতনের এই জীর্ণতাকে অপসারণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কামনার সঙ্গে কর্মের যোগ সাধন করতে হবে। যদি বিগত কয়েক বছরের একটা হিসেব-নিকেশ করি দেখতে পাব, যতটা আবর্জনা ও জীর্ণতা অপসারিত হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। বরং অবর্জনার স্তূপ আরো স্ফীতকায় ও ঊর্ধমুখী হয়েছে, অগ্রহণযোগ্য কিছু নতুন আবর্জনা এসে ডাইনির মত চেপে বসেছে আমাদের সমাজব্যবস্থার ওপর।

রবীন্দ্রনাথ নববর্ষকে বরণ করার ওপরই বাড়তি ঝোঁক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুরাতনের ধুলোবালি ও বর্জ্য অপসারণের বিষয়টা তাঁর নানা লেখায় বার বার এসেছে। যদি আমরা ভাবার চেষ্টা করি বিগত ১৪২০ সাল কেমন ছিল আমাদের জন্য, আমরা অনেকেই হয়ত ত্রস্ত হয়ে উঠব এর উত্তর প্রদানে। অন্তত বিদায়ী বছরের প্রায় নয় মাস বা সিংহভাগ ছিল আমাদের জন্য বড় কষ্টকর এমনকি বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা। জীবনযাত্রার অমন অস্বাভাবিকতার সঙ্গে শুধু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলির তুলনা চলে। এই যে নববর্ষ, তা-ও যে শঙ্কাহীন আমাদের জন্য, তা নয়। আকাশে সিদুঁরে মেঘের আনাগোনা শেষ হয়নি।

বিগত বছরের প্রারম্ভে আমাদের সবার মধ্যে একটা অনুসন্ধিৎসা দানা বেঁধে উঠছিল। ২০১০ সালে, অনেক প্রতীক্ষার পর, অনেক প্রচেষ্টা আর কাঠখড় পোড়ানোর পর বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত ও অনুমোদিত হয়েছিল। এই বিষয়টি আমাদের আশ্বস্ত করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল। আমরা একথাও জানি, আমাদের মত একটা দারিদ্র্যপ্রধান দেশে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন বিশেষভাবে শ্রম ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু বিগত তিন বছরে সমাজে এমন একটা ধারণা ডালপালা মেলেছে যে, শিক্ষানীতি প্রণয়ন বিষয়ে সরকারের পক্ষে যে আন্তরিকতা ও উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, উত্তরকালে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার অনুরূপ কোন প্রতিফলন লক্ষ করা যায়নি।

নতুন বছরে আমাদের সাধারণ প্রত্যাশা এই যে, বিভিন্ন ধাপে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি রোডম্যাপ অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার সদস্যরা নিজেরাই যদি তৎপর হয়ে ওঠেন, তাহলে হয়ত আমাদের পুরোনো বছরের আবর্জনার মত পরিত্যজ্য গড়িমসি দূর হবে। শিক্ষকসমাজ নানা সময় নানা আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকেন, প্রায়শই বেতনভাতা বৃদ্ধির জন্য, কখনোবা উপাচার্য বিতাড়নের জন্য, কখনোবা সরকারের অধীনে চাকুরি করার দাবিতে। ওই শিক্ষককুল পেশাগত সুবিধাদির বাইরে যদি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে তাদের সম্মিলিত চাপ সরকারের ওপর অব্যাহত রাখেন, তাহলেও অন্তত এই নববর্ষ আমাদের জন্য অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org